মণিপদ্ম

প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৬৬

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট.
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদচিত্র
মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

আমার লেখা যে ভালবাসে

তারই হাতে

যত আড়াল, তত কৌতূহল। তিব্বতের বেলাতেও তাই। অন্য দেশ নিয়ে যত বই আছে, তার চেয়ে বোধহয় কম বই নেই তিব্বত নিয়ে। আমিও কিছু কিছু পড়েছি। তার ভিতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাপানী শ্রমণ একাই কাওয়াগুচি, স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা। ছোট ছোট নিবন্ধ লেখকের নাম আমার মনে নেই।

আর একজনের নাম না করলে অন্যায় হবে। তিনি আমার গ্যাঙ্‌টকের বন্ধু শ্রীফণী চক্রবর্তী। পত্রে তাঁর অযাচিত ও অকৃপণ সাহায্য না পেলে আমার নুন-মাখন-মেলানো তিব্বতী চা মোলচা হয়ে থাকত, আস্বাদে সুস্বাদু হতনা।

এদের সকলের কাছে আমার সমান ঋণ।

গ্রন্থকার

৮৬৭ ড্রাইস্‌ডেল রোড,
আসানসোল।

এই লেখকের

রম্যাণি বীক্ষ্য : দক্ষিণ ভারত পর্ব

রম্যাণি বীক্ষ্য : রাজস্থান পর্ব

রূপম্ ?

মধুরাংশ্চ

একটি আশ্বাস

সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত

রম্যাণি বীক্ষ্য : সৌরাষ্ট্র পর্ব (যন্ত্রস্থ)

এক

এত অন্ধকার কোথা থেকে আসে! এমন ঘন, এমন ভারি, এমন নিরন্ধ্র! চোখ দুটো কি অন্ধ হয়ে গেল, না বন্ধ করে আছি! বুকের উপর পাথর রাখে নি তো কেউ! আকাশের সূর্যও কি মরে গেছে! সারা জগৎটাই আজ এমন কালো, না শুধু আমার জগৎটারই আলো হঠাৎ নিবে গেল!

বাতাস কই! বাতাসও ফুরিয়ে গেছে! এত কষ্ট কেন নিশ্বাস নিতে। আমাব নাক কি বন্ধ হয়ে আছে! কিন্তু মুখ দিয়েও তো নিশ্বাস নেওয়া যায়! মুখ খুলতে পাচ্ছি না কেন!

আঃ! এইবারে একটু আরাম পাচ্ছি যেন। অন্ধকার কি স্বচ্ছ হচ্ছে! পাথরটা কি কেউ সরিয়ে নিচ্ছে বুকের উপর থেকে! এত ধোঁয়া আসছে কোথা থেকে! নিশ্বাসের টান তো যাচ্ছে না! তবু যেন একটু আবাম পাচ্ছি। কুয়াশার রঙ কি হলদে হয়!

আবার, আবার অন্ধকাব! এ কোন্ দেশে এলুম! দিনের বেলাতেও এত অন্ধকাব কেন এ দেশে!

গায়ে পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে যখন সকালের ঘুম ভাঙল, তখন নতুন জগতে দেখলুম নিজেকে। অতীত হারিয়ে ফেলেছি রাতারাতি, অতীত যেন আমার কোনদিন ছিল না।

একখানা নিচু তাঁবুর নিচে শুয়ে আছি। গায়ে গোটা কয়েক ভারি ভুটে কম্বল, আর মুখের উপর দুখানা চৌকো মুখ। দু জোড়া ক্ষুদে চোখ জ্বলজ্বল করছে, পরম প্রাপ্তির সম্ভাবনা তাদের দৃষ্টিতে।

সহসা একজন ক্ষিপ্রপদে বেরিয়ে গেল, আর একটা কাঠেব বাটি হাতে তখনই ফিরে এল। খানিকটা পানীয়। মুখ ফাঁক করে মুখের ভিতর ঢেলে দিল। কী উৎকট আস্বাদ তার, কণ্ঠনালি ছুঁয়েই সবটুকু বেরিয়ে এল। এক জোড়া চোখের দীপ্তি নিবে গেল, ধার চাইল আর এক জোড়ার কাছে। কী একটা নির্দেশ পেয়ে আবার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

এক টুকবো লাল কাপড় দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিলেন আর এক জন। তারপর তুটো আঙুলে তাঁব সমস্ত শক্তি জড়ো করে কপালটা রগড়ে দিতে লাগলেন। সমস্ত মাথাটা টনটন কবে উঠল। উত্তাপে, না তাঁর রগড়ানিতে, তা জানি নে। মুখে শব্দ এল ঃ আঃ!

বড় করুণ বড় অসহায় শোনাল নিজের গলার স্বরটুকু। কিন্তু অপর পক্ষের উৎসাহ তাতে বাড়ল। আরও জোরে আমার কপাল রগড়াতে লাগলেন।

এবারে আর একজোড়া চোখ ফিবে এল আব একটা বাটি নিযে। একটু একটু করে অন্য কোন পানীয় মুখের ভিতর ঢেলে দিতে লাগল। দুধের স্বাদ পেলুম। কেমন একটু বিজাতীয় গন্ধ তাতে।

স্বল্প আলোয় দেখলুম, এবাবে দু জোড়া চোখই উজ্জ্বল হল প্রসন্নতায়। দূরে শব্দ হচ্ছিল খুটখাট করে। হাঁকাহাঁকি ব্যস্ততাব অন্ত নেই। তাঁবুর বাহিরে যে জগৎ আছে, ভিতরে তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

এবারে ভাল করে দেখলুম সব কিছু।

আমার বাম দিকে যিনি বসেছেন, তাঁর কপালের রেখা বার্ধক্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে। ভিতরে কী পরে আছেন দেখা যাচ্ছে না, উপরে হাইকোর্টের জজের মতো ঢিলে-ঢালা আলখাল্লা। তার লাল রঙ টকটক করছে। মাথায় হলদে পশমের টুপি। ছবিতে পুরাকালের গ্রীক পুরুষদের মাথায় এমনি হেলমেট দেখেছি। জামার ভিতর থেকে তিনি এবারে

একটি যন্ত্র বার করলেন। হাতলওয়ালা ডুগডুগির মতো। তার গায়ে একটি শিকল, আর মাথায় ভারি গোলা। কথা না বলে নিচের হাতল ধরে সেটি ঘোরাতে লাগলেন। পরে জেনেছিলুম, এটি এঁদের জপের মণিচক্র। এর ভিতরে তুলোট কাগজে লক্ষবার লেখা আছে তিব্বতী ইষ্টমন্ত্র 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'। এই মন্ত্র দেখেছি পথের ধারে ধারে নকশা করে পাহাড়ের গায়ে খোদা আছে।

দক্ষিণে দরজার দিকে বসেছে যে, সে পুরুষ নয়, মেয়ে। তার বয়স অনুমান করতে পারি এমন অভিজ্ঞতা আমার নেই। সমস্ত শরীর ঢাকা পশমের আলখাল্লায়, নোংরা জমে চামড়ার মতো কড়কড়ে হয়েছে স্থানে স্থানে। মাথাটা রুক্ষ অবিন্যস্ত। ঘাড়ের কাছটা ময়লায় আর কালিতে থিকথিক করছে। রঙ ঘষে ঘষে মুখের রঙ হয়েছে পোড়া তামার মতো। একটা উৎকট তীব্র গন্ধ পাচ্ছি রয়ে রয়ে। তার গা থেকে, না চারিদিকের মাটি থেকে, তা বুঝতে পাচ্ছি না।

আমাকে তাকাতে দেখে ফিক করে হাসল। মুক্তোর মতো দাঁত বেরল না। যা দেখলুম তাতে গা ঘিনঘিন করে উঠল। এরা কি মুখ ধোয় না কোনকালে, মুখের ভিতর আর বার? জানি না কত নোংরামি ওই আলখাল্লা দিয়ে ঢেকে রেখেছে! পেটের ভিতর পাক দিয়ে উঠল সদ্য-খাওয়া দুধটুকু।

বাহিরের কোলাহল আরও উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। মানুষের চিৎকার আর জানোয়ারের খুরের শব্দ।

একজন লোক এল ভিতরে, কর্কশ কণ্ঠে কী নির্দেশ দিল। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন, উঠল না মেয়েটি। পুরুষটির কণ্ঠস্বর আরও তীব্র হল, কিন্তু মেয়েটির আচরণে এতটুকু উদ্বেগ প্রকাশ পেল না।

এবারে লোকটি এগিয়ে এল। তার হাত ধরে টেনে তোলবার উপক্রম করতেই সশব্দে সে ফেটে পড়ল। সে কী উত্তাপ! আগুনের মতো জ্বলে উঠল তার মুখ। যত চেঁচাল, তার চেয়ে মুখভঙ্গি করল বেশি। হাতের নখগুলো আরও বড় হলে লোকটাকে হয়তো চিরে

ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত। ভয়ে পিছিয়ে গেছেন ও-ধারের বৃদ্ধ। আমার শরীর বোধহয় হিম হয়ে গেছে বরফের মতো, বুকের ভিতর আর হৃৎপিণ্ডের সাড়া পাচ্ছি না।

পিছবার সময় লোকটা শেষ চেষ্টা করল। কী একটা বলতেই মেয়েটা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার পায়ের উপর। দু চোখ বুঁজে চেঁচিয়ে গর্জে উঠল। প্রলাপের মতো অনর্গল কী বলে গেল, তার একটা কথাও বুঝতে পারলুম না। ও-ধার থেকে বৃদ্ধ ছুটে এসে যখন তাকে তুলে ধরলেন, লোকটা তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কিছুই ঘটে নি এমন একটা প্রশান্ত ভাব নিয়ে মেয়েটি আমার পাশে ফিরে এল। কপালে হাত দিয়ে আমার উত্তাপ অনুভব করল, তারপর গল্প শুরু করল বৃদ্ধের সঙ্গে। এক তরফা গল্প, মেয়েটিই বলে যাচ্ছে তার বলার কথা। কখনও বোঝাবার ভঙ্গি, কখনও সমর্থন পাবার প্রত্যাশা, কখনও বা উত্তেজিত হয়ে উঠছে। বোধ হয় সেই লোকটির অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে। কিন্তু কী সেই অন্যায়!

এমন সমস্যায় কোনদিন পড়ি নি। এই যে কলহ দেখলুম, হয়তো এ আমাকেই উপলক্ষ করে। গৃহস্বামী হয়তো আমাকে আশ্রয় দেওয়ার সমর্থন করে নি। অথচ এই অপ্রীতিকর ঘটনা চোখের সামনে দেখেও প্রতিকার করতে পাচ্ছি না। না বুঝেছি তাদের ভাষা, না আছে এই শয্যা ছেড়ে উঠবার মতো শক্তি। কেমন করে এই পরিবেশের ভিতর এসে পড়েছি, সমস্ত স্মৃতি মন্থন করেও সে কথা স্মরণ করতে পারলুম না।

আলো ছায়ার খেলা দেখে অনুভব করতে পাচ্ছিলাম যে তাঁবুর তলাটা তুলে তুলে অনেকে আমাদের দেখে যাচ্ছে। বাহিরে মানুষ আর জানোয়ারের শব্দ আরও স্পষ্ট হয়েছে। বৃদ্ধও কী একটা ইঙ্গিত করে উঠে গেলেন এবং খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে কোনও সুব্যবস্থার সংবাদ দিলেন। মেয়েটি একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বোধ হয় তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাল।

এক সময় বাইরের কোলাহল শেষ হয়ে গেল। মনে হল, যারা আশেপাশে তাঁবু ফেলে রাত্রিবাস করেছে, তারা আবার তাদের সংসার গুটিয়ে যাত্রা করেছে শুরু। আমার পরিচর্যার জন্য রইলেন এই দুটি প্রাণী। বৃদ্ধ নিঃশব্দে তাঁর ডুগডুগি ঘুরিয়ে চললেন, আর মেয়েটি বারে বারে কম্বল টেনে আমার উত্তাপ পরীক্ষা করতে লাগল।

পৃথিবীতে প্রভাত হয়েছে অনেকক্ষণ। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখেছি জ্যোতির্ময়ের প্রসন্ন প্রকাশ। ইচ্ছা হল, বাইরে বেরিয়ে সেই উদার আশ্বাস বুক ভরে গ্রহণ করি। কিন্তু পারলুম না, শীতে আড়ষ্ট হয়ে আছে পা দুখানা। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে ব্যথা ঘনিয়ে আছে বাতের মতো। মাথার যন্ত্রণায় আমার চেতনা অভিভূত হয়ে আছে।

মেয়েটি মুখ নামিয়ে কী একটা প্রশ্ন করল। মনে হল, শরীরের খবর জানতে চাইছে। একটুখানি ম্লান হেসে জবাব দিলুম: ভাল আছি।

ঠাণ্ডায় আমার ঠোঁট নড়ল না।

বিদ্যুতের মতো উঠে দাঁড়িয়েই মেয়েটি পালিয়ে গেল। ভয় হল, অপমান করলুম না তো নিজের অজ্ঞাতসারে!

অল্পক্ষণেই সে ফিরে এসে খানিকটা ছাতু আর দই সামনে ধরল। বুঝতে পারলুম, আমার উত্তর দেওয়ায় ভুল হয়েছিল। এই নোংরা পরিস্থিতির মধ্যে সুস্থ মানুষেরও ক্ষিধে পায় না, গা গুলিয়ে ওঠে খাবার কথা ভাবলে।

মেয়েটি মুখের কাছে খাবার তুলে ধরল। ফেলতে পারলুম না। খানিকটা বিদঘুটে গন্ধ পেলেও খেয়ে তৃপ্তি পেলুম। মনে হল, যেন অনেক দিন কিছু খাই নি। দেহের স্নায়ুগুলো সব না খেয়ে খেয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিল।

ছোট চোখ দুটো বিস্ফারিত করে মেয়েটি আমার খাওয়া দেখছিল। শেষ হতেই আবার মুখ নামিয়ে কী জানতে চাইল। ভাবলুম, জানতে চাইছে কেমন লাগল খেয়ে! আগের মতোই হেসে উত্তর দিলুম: ভাল।

মেয়েটি আবার ছুটে বেরিয়ে গেল। আবার নিয়ে এল দই আর ছাতু। আবার খেলুম।

এবারে লুকিয়ে আনল কিছু কিসমিস বাদাম আর শুকনো খেজুর। বৃদ্ধের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দেখলুম। আমি সোজা হয়ে বসে কড়মড় করে খেজুর খেয়ে বিচিগুলো ছুঁড়ে ফেলতে লাগলুম তাঁর চোখের সামনে দিয়ে।

মাথার যন্ত্রণা এল কমে। রৌদ্রের তাপে গায়ের ব্যথাও খানিকটা কমল। শুধু চোখ দুটো অল্প অল্প জ্বালা করছে।

দুপুরে কম্বল বিছিয়ে বৃদ্ধ ঘুমলেন। আমাকে জেগে থাকতে হল। প্রহরীর মতো কড়া পাহারায় মেয়েটি আমায় জাগিয়ে রাখল। একটা কাঠের বাটিতে খানিকটা ঠাণ্ডা জল রেখেছিল। চোখের পাতা বুঁজে এলেই জলের ঝাপটা দিল মুখে, কথা বলল অর্থহীন প্রলাপের মতো। তাতেও যখন ঘুমে আর ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ছিলুম, তখন পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে সামনের দিকে ঠেলে দিতে লাগল। সেই উষ্ণ আলিঙ্গনে রোমাঞ্চ ছিল, ভয় ছিল আরও বেশি। এক সময় সেই ঝিমুনি আমার কেটে গেল।

পরে জেনেছিলুম, এ দেশের রীতিই এমনি। অসুস্থকে এরা দুপুরে ঘুমতে দেয় না। চিকিৎসক এমনি কড়া নির্দেশ দিয়ে রাখেন যে, প্রয়োজন হলে পালা করে তারা রোগীকে জাগিয়ে রাখে। এদের ধারণা যে ঘুমলে রোগ বাড়ে, আর রোগী মারাও যায় ঘুমন্ত অবস্থায়। তাই এই সতর্কতা।

খানিকক্ষণ পরে হাই তুলে বৃদ্ধও উঠে বসলেন। মুণ্ডিতকেশ বিরলশ্মশ্রু সৌম্য মূর্তি তাঁর। আমার শরীরের উন্নতি লক্ষ্য করে প্রসন্ন হলেন। মেয়েটিকে কী নির্দেশ দিতেই সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমার ইচ্ছে হল, আমিও তার সঙ্গে বেরিয়ে যাই। শরীরে

বল পেয়েছি, উৎসাহ পাচ্ছি মনে। বাইরে এতক্ষণ যে ঝড়ের মতো বাতাস বইছিল, তা শান্ত হয়ে এসেছে। চোখ মুখ শুকিয়ে উঠেছে সেই হাওয়ায়। চোখের জ্বালা এতটুকু কমছে না। ভাবলুম, ঠাণ্ডা জলে মুখ-হাত ধুলেই খানিকটা আরাম পাব। সারাদিন জল ঠেকেনি শরীরে, সেই অতৃপ্তি এখন মনে খোঁচা দিচ্ছে।

আমি উঠবার চেষ্টা করতেই বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে লাফিয়ে উঠলেন। কথায় ও ইশারায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন ঘন ঘন। সে মানা না শুনে আমি তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলুম।

কী উদার দিগন্ত! যত দূর দৃষ্টি চলে শুষ্ক রুক্ষ প্রান্তর আর বৃক্ষলতাহীন পর্বতের শ্রেণী। এক জায়গায় ব্রাহ্মীশাকের মতো পাতার ছোট ছোট কাঁটাগুল্ম, কঠিন তাদের ডালপালা। তারই আশেপাশে চরছে গোটাকয়েক ঝব্বু আর ছাগল, মাটিতে তাদের লোম লুটোচ্ছে। পাশের একটা ছোট তাঁবুর সামনে পা ছড়িয়ে বসে দুজন পুরুষমানুষ ঝিমচ্ছে, আর ভিতরে হাপরের শব্দ পাচ্ছি নিরবচ্ছিন্নভাবে।

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। সেখানেই বসে পড়লুম। দুরন্ত অতীত আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

গ্রীষ্মের ছুটিতে আলমোড়া বেড়াতে এসেছিলুম। যুদ্ধ বেধে বিশ্বের আকাশটা তখনও এমন ঘুলিয়ে উঠে নি। ছোটখাট তীর্থ-যাত্রীর দল চলেছে কৈলাসের পথে। আমার ভবঘুরে মনে মানস সরোবরের দোলা লাগত, স্বপ্ন দেখতুম অনন্ত তুষারমণ্ডিত শুভ্র কৈলাসের। একে একে রামকৃষ্ণ কুটীরের যাত্রীরা সবাই চলে গেলেন। এম্পায়ার হোটেলের সামনের পথে তাঁদের পদধ্বনি মিলিয়ে গেল। ভাবলুম, এখানেই যবনিকা পড়ল আমার কৈলাসযাত্রার। এত দূরের পাড়ি জমাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বার হই নি, এ ভালই হল।

কিন্তু আমার বিধাতা যে নিজেও ভবঘুরে। আমাকে শাস্তি দিয়ে যে তাঁরও শান্তি নেই। ও-হেনরি নামে এক মার্কিন ভদ্রলোক এলেন

আলমোড়ায়। বললেন, কৈলাস যাব। কৈলাস দেখতে নয়, কিসের টানে মানুষ এমন দুর্গম পথ অতিক্রম করে তাই জানতে। ভারত থেকে দলে দলে যায় হিন্দু নরনারী, তিব্বত থেকেও আসে বৌদ্ধ নরনারী। বছরের পর বছর—যুগের পর যুগ। কোথায় এদের অফুরন্ত প্রেরণার উৎস!

ভদ্রলোক খানসামা নিলেন একটা, গাইড ভাড়া করলেন একজন, আর সঙ্গের মাল বহন করবার জন্য নিলেন ঘোড়া আর কুলি। ঠিক হল, লিপুলেক পাস দিয়ে না গিয়ে যাবেন জোহারের রাস্তায় গ্যানিমা মণ্ডি হয়ে। তাতে কয়েক দিনের পথ সংক্ষেপ হবে।

এ সংবাদ এল হাওয়ায় ভেসে। এবারে আর অস্থির মন বাধা মানল না। কিছু শুকনো খাবার আর কিছু গরম কাপড় পিঠে বেঁধে আমিও তাদের সঙ্গ নিলুম। লোকে বলল, অসাধ্য কাজ করছি। আমি বললুম, মানুষের অসাধ্য কাজ দুনিয়ায় নেই।

কী দুর্গম দুস্তর পথ! পাহাড়ে পথ যে এমন কঠিন হয় তা জানা ছিল না। কোম্পানীর রেলে চড়ে দক্ষিণে গিয়েছি সেতুবন্ধ রামেশ্বর, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের বাসে বসে কন্যাকুমারী, পশ্চিমে ওখা থেকে নৌকোয় চেপে বেটদ্বারকা, উত্তরে কাশ্মীর আর খাইবার পাস থেকে পূর্বে মণিপুর আর সদিয়া। জাহাজে চেপে বমি করতে করতে গিয়েছি রেঙ্গুন আর সিঙ্গাপুর, ফিরেছি সিংহল হয়ে। কিন্তু নিজের পা দুখানি মাত্র সম্বল করে এমন জনমানবহীন অজানা পথে কোনদিন বেরই নি।

সে কী দুর্লঙ্ঘ্য পথ! জয়ন্তী, আন্তাধুরা, কুংরি-বিংরি গিরিসংকট। এক-একটা পাস পেরবার সময় মনে হত, এমন পরীক্ষায় পাস হন নি সীতাদেবী। তাঁর অগ্নিপরীক্ষাও এর চেয়ে সহজ ছিল। কোন একটা গিরিসংকট অতিক্রম করবার সময় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, বুকের কলকব্জা বুঝি থেমে যাচ্ছে।

সাহেবের সঙ্গে পথে ভাব হয় নি, তিনি এগিয়ে গেছেন।

তাঁর পিঠে বোঝা নেই, আর তাঁর সঙ্গীরা পিঠে বোঝা নিয়েও তাঁকে ছাড়িয়ে চলতে পারে।

আমি চলেছি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। অনিদ্রায় অর্ধাহারে আমার শক্তির উৎস গেছে শুকিয়ে, উৎসাহের ভরা গাঙে ভাঁটা পড়েছে অতর্কিতে। শ্রীনগরে একটা শীত কাটিয়েছিলুম, বরফপড়া দেখতে গিয়েছিলুম সেখানে। ইংরেজী বইএ বরফের গল্প পড়ে আর ছবিতে পেঁজা তুলোর ইলশেগুড়ি দেখে শখ হয়েছিল বরফ দেখার। দেখেও ছিলুম। জানলার সার্সিতে শিশির জমলেই ওভারকোট চড়িয়ে টুপি মাথায় বেরিয়ে পড়তুম, খেলা করতুম সেই তুলোর মতো দানা হাতে নিয়ে, পথের উপর নরম মিছরির গুঁড়োয় ভারি জুতো ঠুকে ঠুকে আর শক্ত পাথরের চাঁইএর উপর বেপরোয়া ছুটোছুটি করে। রাতে পুরু স্প্রিঙের গদিতে শুয়ে কম্বল আর লেপ মুড়ি দিয়ে ম্যাকডুগালের অ্যাব্‌নর্মাল সাইকলজির পাতায় নিজের পাগলামির প্রতিবিম্ব খুঁজতুম। সেও শীত, আর এও শীত। সে যেন খিড়কির পুকুরে নেমে সমুদ্রস্নানের আস্বাদ পাবার মতন। কিংবা শিবরাত্রির উপবাস করে অনাহার-মৃত্যুর বিভীষিকা দেখার মতন। বড়বাজারের গলিতে কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে ছাতুর দলা খেতে দেখেছি ছাতুখোর মজুরকে। হেসেছি তার ছাতুপ্রীতি দেখে, তার দেশাচার নিয়ে উপহাস করেছি নির্দয়ভাবে। আজ ঝরনার জলে সেই ছাতু গুলে খাবার সময় চোখে ঝরনার জল নামল। অমৃতের আস্বাদ পেলুম শুকনো ফলের ভিতর।

নিজের নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিয়ে সাধ মেটে না। জীবনে আজ ঘৃণা ধরেছে। এ পথে বেরবার আগে যদি ঘুণাক্ষরেও জানতুম যে, বিশ্বের ভাণ্ডারে এত কষ্ট আছে মানুষের জন্য, তবে এমন অনির্দিষ্টের পথে কিছুতেই একাকী বেরতুম না। সাহেবরা এগিয়ে গেছেন, তাঁদের চরণচিহ্ন মুছে গেছে সঙ্কীর্ণ পার্বত্যপথ থেকে। আমি চলেছি লাঠি ঠুকে ঠুকে, ওইটুকু শব্দেই যেন খানিকটা আশ্বাস এখনও বুকের ভিতর ধুকধুক করছে।

পাহাড়ে চলবার উপযোগী একজোড়া জুতো কিনেছিলুম আলমোড়ায়। কিন্তু অনভ্যস্ত পথে চলতে গিয়ে বাঁ পায়ে একটা ফোস্কা পড়েছিল। সেটা গলে পেকে উঠেছে এখন। একসঙ্গে বেশি পথ চললেই টনটন করে সারা শরীর অবশ হয়ে আসে। রাস্তার ধারে কোন ঝরনা কিংবা পাথর দেখলে খানিকটা জিরিয়ে নিই।

আকাশে একখণ্ড মেঘ দেখছিলুম অনেকক্ষণ থেকে। এবারে ঘনিয়ে নিচে নেমে এল। হলদে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল আকাশের একটা দিক। পাহাড়ে শিলাবৃষ্টির কথা পড়েছি। তার ভয়াবহতা লিখে ভয় দেখিয়েছেন অনেক ভ্রমণ-কাহিনীর লেখক। এবারে যদি তেমন বৃষ্টি শুরু হয় তো খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে মাথাটা বাঁচাতে পারব কি না জানি না। একটা গুহা কিংবা একটু আশ্রয়ের সন্ধানে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটতে লাগলুম।

আশ্রয় যখন পেলুম তখন দম ফুরিয়ে গেছে। ক্লান্ত শরীরটা কোন রকমে একটা গুহার ভিতরে টেনে এনেই মাটিতে এলিয়ে পড়লুম। বাইরে তখন ধারা নেমেছে, মেঘে ঢাকা পড়েছে অস্তগামী সূর্য।

পথের ধারে পাহাড়ের গায়ে এমন গুহা দেখেছি অনেক, কিন্তু এমন তপস্বী দেখি নি। একটি পরিচ্ছন্ন বেদীর উপর বুদ্ধের ধ্যানমূর্তি স্থাপন করা আছে। বেদীর সামনে একখানি মোটা কম্বলের উপর মৃগচর্মের আসন। তারই উপর ধ্যানমগ্ন যোগী। আমার পায়ের শব্দে তাঁর তপোভঙ্গ হল না। আমি নিঃশব্দে তাঁর আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলুম।

কত দণ্ড গেল জানি না, আমার সম্বিৎ ফিরে এল তাঁর ঘণ্টার শব্দে। ইশারায় একটা পাত্র দেখিয়ে দিলেন। উঠে গিয়ে দেখলুম, তাতে দুধ আছে—অল্প অল্প ধোঁয়াও যেন উঠছে। এই শৈত্যের ভিতর উত্তাপ এল কোথা থেকে!

ইশারাতেই তিনি পান করতে বললেন। না বললেও হয়তো খেয়ে ফেলতুম। নীতির কথা ভুলে গেছি, পেটে ক্ষিদে না থাকলে নীতির গল্প শুনতে ভাল লাগে।

যোগী কথা বললেন না। মাটিতে কী আঁচড় কাটলেন, পড়তে পারলুম না। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন ফিরে যেতে। যে দিকে চলেছি সে পথ আমার নয়। যে দিক থেকে এসেছি, সেই পথেই ফিরে যাবার আদেশ পেলুম। হিসেব করে দেখলুম, আর দু-তিনটে দিনের রাস্তা, তার পরেই গ্যানিমা মণ্ডি। হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশ থেকে আসে ভারতীয় বণিক তিব্বতী ক্রেতার জন্য নানা উপকরণ নিয়ে। ফেরে তিব্বতের জিনিস নিয়ে—উল, চামর আর চমরীর মাখন। ফোঁটা ফোঁটা বুকের রক্ত ঢেলে এসেছি এই পথে। শুধু দিয়েই যাব, নিয়ে যাব না কিছু?

রাত্রির জন্য আশ্রয় চেয়ে ব্যর্থ হলুম। ঠাঁই নাই তাঁর ছোট তরীতে। চূড়ান্ত আদেশ দিয়েছেন ফিরে যাবার, ফিরে না গেলেও বেরিয়ে যেতে হবে তাঁর গুহা থেকে।

শেষে বেরিয়ে এলুম। কিন্তু ফিরতে পারলুম না। আকাশ স্বচ্ছ হয়ে গেছে। মেঘ নেই, আলোও নেই। দুধ খেয়ে খানিকটা বল পেয়েছি শরীরে। আর একটা আশ্রয়ের খোঁজে এগিয়ে চললুম।

দূরে দু-তিনজন লোক দেখতে পেলুম। ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে বাঁক ঘুরে এগিয়ে আসছে। তাদের মাথায় টোকার মতো টুপি, পিঠে গাদা বন্দুক, কোমরে আঁটা তলোয়ারের মতো ভোজালি। ডান হাতে রুল উঁচিয়ে, বাঁ হাতে লাগাম টেনে এগিয়ে আসছে।

আলমোড়ায় এ দেশের ডাকাতের গল্প শুনেছিলুম। খুন জখম লুঠ আর ডাকাতি পেশা—এমন লোকের অভাব নেই তিব্বতে। খাম আর ডামগ্যা-শোর লোকেরা অন্য কোন পেশা জানে না, এমনি প্রবাদ। গায়ের জামা কাপড় গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে নেবার উপদেশ দিয়েছিল কেউ কেউ। তিব্বতী লামা আর ভারতীয় সাধুদের নাকি এরাও শ্রদ্ধা করে। আর ভয় পায় বিলিতী বন্দুক আর পিস্তলকে। এদের পিঠের গাদা-বন্দুকের দু দিকে সঙ্গীনের মতো বাহু আছে দুটো, মাটিতে পুঁতে পলতেয় আগুন দিয়ে তাক করতে

হয়। অনেকে আজকাল শোভার জন্যই বন্দুক রাখে, তার ব্যবহার অনেক দিন ভুলে গেছে। একটা মজার গল্পও শুনিয়েছিলেন আলমোড়ার এক ভদ্রলোক। কে একজন যাত্রী নাকি চামড়ার কেসে একটা খেলনা পিস্তল রেখেছিল কোমরে গুঁজে। ঘোড়ায়-চড়া লোক দেখলেই সেই খেলনাটি হাতে নিয়ে লোফালুফি করত। তার কাছে ঘেঁষতে কেউ সাহস পায় নি। আমার সঙ্গে আজ গেরুয়াও নেই, পিস্তলও নেই।

এই অসাবধানতার মূল্য একটু বেশীই দিতে হল। তিনটি লোক তিন দিক থেকে ঘিরে দাঁড়াল। সব-কিছু সমর্পণ করে প্রাণভিক্ষা করা ছাড়া তো আর উপায় নেই। নিঃশেষে সব দিয়ে প্রাণটুকু রক্ষা করলুম। পরে জেনেছিলুম, শাস্ত্র পাঠ করে কিছু খাদ্য চাইলে তারা নাকি দিন তিনেকের মতো খাবার জিনিস ফিরিয়ে দেয়। আমি শাস্ত্র জানি নে, এদের রীতির কথাও শুনি নি। সর্বস্ব না দিলে যে এই পরিজনহীন দেশে প্রাণটুকুও যাবে, এইটুকুই শুধু নিঃসন্দেহে জেনেছিলুম।

রাত্রে একটা গুহায় শুয়ে মনে হয়েছিল, কাল প্রভাতে আর সূর্যোদয় দেখতে পাব না, সূর্যের আলো এক তাল বরফ দেখবে এই গুহার ভিতর। এত শীত! আর বেঁচে থেকেই বা লাভ কী? খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, অর্থও নেই। এই জনহীন পর্বতের উপর শুধু প্রাণ নিয়ে কী করব? এক রকমের পৈশাচিক আনন্দ এল মনে। জীবনে এমন আনন্দের আস্বাদ বুঝি পাই নি।

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। ঠাণ্ডায় হিম হয়ে আসছে সারা শরীর। পায়ের যন্ত্রণা আরও বেড়েছে। কিন্তু কী আশ্চর্য প্রশান্তি মনে! বোঝা নেই, ভাবনা নেই, প্রাণের মায়াও মিটে গেছে। যে প্রাণ যাবেই, নিঃশেষে যেন ফুরিয়ে গেছে তার দায়।

গুহার বাইরে এসে দেখলুম, রাত শেষ হতে আর দেরি নেই। আকাশে পাণ্ডুর চাঁদের আলো, নক্ষত্রের সমারোহ হয়েছে ম্লান।

সামনের সঙ্কীর্ণ পথ কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ওইটুকু পেরলেই কি আলোর সন্ধান মিলবে—উদার ঐশ্বর্যে-ভরা আসন্ন জীবনের ইঙ্গিত ?

মনে হল, নতুন জীবন পেয়েছি। নতুন উদ্যম, নতুন পথের পদচিহ্ন। ক্লান্তি কেটে গেল, ক্ষুধা ভুলে গেলুম। অন্ধকারে পা টিপে টিপে এগিয়ে চললুম।

এক সময় আকাশ স্বচ্ছ হয়ে এল, তারপর উজ্জ্বল হল, ঝলমল করে উঠল বরফের পাহাড়গুলো।

কয়েকদিন থেকেই একটা জ্বালা অনুভব করছিলুম দু চোখে। দুপুরে যখন রুক্ষ হাওয়া বইতে শুরু হয়, তখন তাকাতে কষ্ট হয়। ধরণীর সুধা-শ্যামলিমা কবে শেষ দেখেছি মনে পড়ে না। এখন বিস্তীর্ণ প্রান্তর দেখি, স্থানে স্থানে রুক্ষ বিবর্ণ তৃণগুল্ম, কাছে দূরে রুক্ষ পর্বতমালা—ধূসর আর গৈরিক, তারই পিছনে মাথা উঁচিয়ে আছে তুষার-ধবল নগ্ন গিরিশৃঙ্গ।

সূর্যের কিরণ যেন আজ আরও প্রখর হয়েছে। আগুনের দলার মতো জ্বলছে চোখ দুটো। বৃষ্টির জলে আকাশ ধুয়ে গেলে কি রোদ আরও তীব্র হয়!

দুপুরে ঝড়ের মতো বাতাস বইতে শুরু হল। রোজই এমন হয়। কিন্তু আজ বড় অসহায় মনে হল নিজেকে। অনিদ্রায় আর অনাহারে মাথার ভিতরটা জ্বলছে দপদপ করে। চোখ দুটো ফুলে উঠে অবিশ্রাম জল ঝরছে। মনে হল, বুঝি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি, চোখের মণি বেরিয়ে আসছে তাদের গর্ত থেকে।

ঝরনার জল চোখে চেপে ধরলুম। আরাম পেলুম, কিন্তু আরোগ্য হল না। চোখ খুলে আর চলতে পারি না। চোখ বন্ধ করেও চলা যায় না। না চললেও অনাহারে বসে থেকে মৃত্যুর অপেক্ষা করা দুঃসহ।

চোখের উপর ভিজে রুমাল চেপে গড়িয়ে গড়িয়ে আরও একটা দিন গেল। এদিকে কি মানুষের বাস নেই! মানুষ কি এ পথে চলে

নি কোনদিন ! মানুষ না দেখলেও এতদিন মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখেছি। সে পথে গেছে খচ্চর আর ঘোড়া, কখনও কাঁকরের উপরে শুকনো ধুলো উড়িয়ে, কখনও মিছরির দানার মতো বরফের কুচি ছড়িয়ে। কিন্তু আজ এ কোন্ পথে এলুম !

ঝরনার জল খেয়ে আর যে পা চলে না ! চোখে অন্ধকার দেখছি ; সূর্য কি মরে যাচ্ছে ! কালো পুরু জমাট অন্ধকার এমন ঘন এমন ভারি এমন নিরন্ধ্র ! চোখ দুটো কি অন্ধ হয়ে গেল, না বন্ধ করে আছি ! বুকের উপর পাথর রাখে নি তো কেউ !

এ কোন্ দেশে এলুম ! দিনের বেলাতেও এত অন্ধকার কেন এ দেশে !

দুই

বৃদ্ধ আমার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এসেছিলেন। এবারে দু হাত বাড়িয়ে আমাকে টেনে তোলবার চেষ্টা করলেন। বললুম: সাহায্য আমি চাই নে, চাই একটু জল—পানি—ওয়াটার।

সারাদিন মুখ-হাত ধুই নি, বড় অপরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছিল নিজেকে। বৃদ্ধ আমার ইংরেজী কথাটি ধরতে পেরে যেন গলে গেলেন, বললেন: ওয়াটার! ছু?

ইংরেজী কথা শুনে গায়ে রোমাঞ্চ জাগল। মনে হল, পরশমণি পেয়েছি মুঠোর মধ্যে। অনেক দিন পরে আজ মানুষের সঙ্গে ভাব-বিনিময় করতে পেরেছি, এই খুশিতে মন ভরে উঠল।

বৃদ্ধ আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ছুটে গিয়ে অন্য তাঁবুতে ঢুকে পড়লেন। এবং খানিকক্ষণ পরেই নিজেব হাতে এক পাত্র জল এনে হাজিব করলেন।

সেই জলে আমি যখন আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে দাঁত মাজছি, সেই মেয়েটি দুটো চায়েব বাটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। আমার মুখ-হাত ধোয়ার দিকে এমন করে তাকিয়ে রইল, যেন এমন অপূর্ব জিনিস কোনও কালে দেখে নি। এই ঠাণ্ডার দেশে এমন বরফ-গলা ছু কেউ সাধ করে গায়ে ছোঁয়ায়!

মেয়েটি বড় করুণভাবে বৃদ্ধকে জানাতে লাগল: থেরিং সাঙ্ নিমা শিটা ঠান্ মো ডু?

বোধ হয়, এমন একটা অপরাধ করছি চোখের সামনে অথচ তার প্রতিবাদ করছেন না কেন। বৃদ্ধকে বলতে হল: ভেরি কোল্ড ইন্ডিড—ছু দি শিটা ঠান্ মো ডু?

আমি রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললুম : নট টু কোল্ড ফর এ ওয়াশ।

বৃদ্ধ তার অনুবাদ শোনালেন মেয়েটিকে।

জলের পাত্র রেখে আমি চায়ের পাত্র হাতে নিলুম। এক চুমুক মুখে নিতেই একটা উৎকট গন্ধ লাগল নাকে। সকালবেলায় এমনি গন্ধ পেয়ে সবটুকু বমি করে ফেলেছিলুম। এবারে আর বমি হল না। মনে পড়ল, ছেলেবেলায় ইংরেজী বইএ পড়েছিলুম যে এই চা খেয়ে বমি করলে বা ফেলে দিলে বিদেশীদের এরা মেরে ফেলে। এত দুঃখেও মেরে ফেলার নামে ভয় এল মনে, নিশ্বাস বন্ধ করে চুমুকে চুমুকে নিঃশেষ করে দিলুম বাটিটা। এরা কি মুখশুদ্ধি খায় না? একটা এলাচ কিংবা লবঙ্গ পেলে মুখটা পরিষ্কার করে নিতুম।

মেয়েটি কী যেন জিজ্ঞাসা করল। বুঝতে না পেরে তাকালুম তার মুখের দিকে। বৃদ্ধ বললেন : মোর?

এমন চায়ের আর দরকার নেই। বললুম : নো, থ্যাঙ্ক্স।

বৃদ্ধ তাকে বুঝিয়ে দিলেন এর মানে। নিজের চাটুকু খেলেন রসিয়ে রসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর পেয়ালাটা মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে বোধহয় আরও খানিকটা চাইলেন।

এবারেও মেয়েটি আনল দু বাটি চা, এক বাটি বৃদ্ধের জন্য আর এক বাটি নিজের। বড্ড নোংরা দেখলুম নিজের বাটিটা, চায়ের দাগে দাগে কলঙ্কিত হয়ে আছে।

বৃদ্ধ একটা ঢিপির উপর একটু উঁচুতে বসে ছিলেন। মেয়েটি বসল তাঁর পায়ের কাছে।

নিতান্ত সরল ইংরেজীতে বৃদ্ধ নিজের পরিচয় দিলেন চীনদেশের লামা বলে। লাসার পথে এসেছেন এ দেশে, খাং রিম্‌পোছে আর ছো মা ফাম মানে কৈলাস আর মানস সরোবর দেখে দেশে ফিরবেন। অতীশ দীপঙ্কর গিয়েছিলেন রেত্তাপুরী, তাই রেত্তাপুরীর মঠ দেখবারও শখ আছে। গ্যানিমার মণ্ডি পেরিয়েছেন। আর

খানিকটা এগোলে গ্যাকার্কোর মণ্ডি। আমার শুশ্রূষার জন্যই আটকে গেছেন এখানে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: ইংলিশম্যান?

বুঝলুম, আমার পোশাকে ভুল করেছেন। নিজের গায়ের রঙ সম্বন্ধে এমন উঁচু ধারণা নেই যে, লোকে আমাকে ইংরেজ বলে ভাবতে পারে ভেবেই গর্ব বোধ করব। আগে বাঙালী বলে পরিচয় দিতুম, আজকাল ভারতীয় বলি। প্রাদেশিকতা যে নীচতায় নেমেছে, তাতে প্রদেশের নাম করতেই লজ্জা হয়। বললুম: ইণ্ডিয়ান।

লামা গভীর সন্তোষ প্রকাশ করলেন মাত্র একটি কথায়: ইণ্ডিয়ান! বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষের লোক!

তেমনই একটা শ্রদ্ধার সঙ্কেত দেখলুম মেয়েটির চোখে। কথাটি বুঝিয়ে দিতেই মেয়েটির দৃষ্টি আরও সিক্ত হল।

লামা জানতে চাইলেন, কী করে এখানে এলুম। কী করে এলুম, তা আমার জানা নেই। যতটুকু জানি খুলে বললুম। থেমে থেমে ধীরে ধীরে ইংরেজীকে যথাসম্ভব সরল সহজবোধ্য করে গল্পটি শোনালুম। বাকিটুকু শোনালেন লামা নিজে।

এখান থেকে কিছু দূরে অচেতন পড়ে আছি, এই খবর এনেছিল এদের একজন চাকর। গোটাকয়েক ইয়াক এদের হারিয়ে গিয়েছিল বিকেলবেলায়, তারই খোঁজে সেই লোকটা গিয়েছিল। কিছু প্রাপ্তির লোভে এই মেয়েটির স্বামীরা তোমায় আনতে গেল, সঙ্গে তিনিও গিয়েছিলেন। আর্তের সন্ধান পেয়ে তার সেবা না করলে বুদ্ধের কাছে কী জবাব দেবেন তিনি!

আমার কাছে সোনাদানা তো কিছুই বেরল না। ভারতীয় মুদ্রাও ছিল না একটা, যা পেলে তাদের স্ত্রীর গলার মালার একটা লকেট হত। সভ্যজগতের হাটে কানাকড়িও দাম নয় যে দেহটার, তা বয়ে নিয়ে গিয়ে তারা কী করবে! ছাগল কিংবা চমরী হলে কেটে ভোজ খাওয়া চলত, তার চামড়ারও একটা দাম আছে। কিন্তু মানুষের

দেহ! বিত্তহীন অশক্ত মানুষ! বয়ে নিয়ে গিয়ে তো গণ্ডেপিণ্ডে গেলাতে হবে নিজেদের পরিশ্রমের গ্রাস কেটে। তারপর কতদিন সেবা-শুশ্রূষার পর সে দেহ সমর্থ হবে, তারও হিসেব নেই। আর যদি নাই বাঁচে, তাতেও যন্ত্রণা কম নয়। বিদেশে বাণিজ্য আর তীর্থ করতে এসে কেন বাপু ভূতের শ্রাদ্ধ ঘাড়ে নেওয়া!

লামা তাদের বুদ্ধের বাণী শোনালেন, বোঝালেন নানা রকম করে। কিছুতেই তারা রাজী হল না। শেষে বললেন, তিনিও রইলেন এই মৃত্যুপথযাত্রীর সঙ্গে। যদি মরতে হয় দুজনেই মরবেন, কিন্তু তাদের এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে সারা জীবন দিয়ে।

এবারে কেউ কেউ ভয় পেল, পেল না শুধু যে ভয় পেলে কাজ হত সেই বড় ভাই। সে বলল, বিদেশী আমাদের শত্রু। তুমি চীনা না হয়ে তিব্বতী হলে শত্রুকে আশ্রয় দেওয়াকে ধর্ম বলতে না। লামাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু সে আমাদের নিজেদের লামা। যারা লামা সেজে ঘরের খবর বের করে নিতে আসে, তাদেব মুখে আমবা বুদ্ধের বাণী শুনতে চাই না।

বড় করুণ, বড় অসহায় দেখাল তাব ছোট ভাই দুটোকে। বড় ভাই-এর আদেশ অমান্য করবার সাহস যেমন নেই, লামার রোষদৃষ্টিব ভয়ও আছে তেমনই। নিঃশব্দে বড় ভাইকে অনুসরণ করবার আগে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে গেল বারংবার।

লামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: সেই পথহীন প্রান্তরের ভিতর একা পড়ে রইলুম তোমাকে নিয়ে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে চারিদিক ঘিরে। এবারে মৃত্যুব ছায়া নামতে শুরু হবে। আমি তোমার পাশে বসে বুদ্ধকে শরণ করবার চেষ্টা করলুম। মনে বল এল। ভাবলুম, বুদ্ধ যদি আজও বেঁচে থাকেন তো সেই বিধর্মীদের আবার ফিরে আসতেই হবে। চোখ বুজে তাঁর ধ্যান করতে লাগলুম। সত্যিই তারা ফিরে এল। আমার বিশ্বাসের হল জয়, কৃতজ্ঞতায় আমার দু চোখ জলে ভরে গেল।

আমার দৃষ্টিতে কৌতূহল লক্ষ্য করে বললেন : এদের সংসারে সবচেয়ে বড় সত্য এদের স্ত্রী। লামার উপদেশ লঙ্ঘন করতে পারে এমন পাপী আছে তিব্বতে, কিন্তু স্ত্রীর আদেশ উপেক্ষা করতে পারে এমন পুরুষ মিলবে না সারা দেশটায়। পরে শুনেছিলুম, সেই লোকটার ছোট ভাইরা তাদের স্ত্রীকে জানিয়েছিল ঘটনাটা, আর এই মেয়েটি তখুনি তার বড় স্বামীর দেওয়া অলঙ্কারটি মাথা থেকে খুলে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। বলেছিল, এমন নিষ্ঠুরতার কাজ করলে সে একটুও দ্বিধা করবে না তার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করতে। লামার আদেশ অমান্য করে যে পাপী, তার সঙ্গে সংসার করাও পাপ।

হেসে বললেন : নিরীহ মেষশাবকের মতো ফিরে এল ভাইরা সব।

পরম আগ্রহ নিয়ে মেয়েটি আমাদের গল্প শুনছে। মর্মার্থ বোঝবার দরকার নেই, শুধু এইটুকু জেনেই নিশ্চিন্ত হয়েছে যে, তার আন্তরিক সেবায় একজন আর্তকে মৃত্যুর পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছে, আর পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় একজন ধর্মগুরুব সম্মান রক্ষা করে তাঁর রোষ থেকে সংসারকে রক্ষা করেছে।

আমি সকালের সেই অপ্রিয় ঘটনাটির উল্লেখ করলুম। মেয়েটিব মাথায় একটা হাত রেখে লামা তার কল্যাণ কামনা করলেন। বললেন : বুদ্ধ একে আশীর্বাদ করবেন।

আমি সম্পূর্ণ ঘটনাটা শোনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলুম। লামা বললেন : এর স্বামীরা বাণিজ্য করতে এসেছে। গ্যানিমার কাজ সেরে গ্যাকার্কো যাচ্ছে কিছু পরিচিত পাহাড়ী আর ভোটিয়া ব্যবসায়ীর সঙ্গে কারবারেব জন্য। সেখান থেকে তীর্থ সেবে দেশে ফিরবে। পথে কোন ঝামেলা পোয়াতে এরা চায় না। তোমার পায়ে যে ক্ষত, তা কতদিনে সারবে তার তো ঠিক নেই। অনির্দিষ্ট কালের জন্যে তাদের অপেক্ষা করা চলে কি!

মুহূর্তে আমার দৃষ্টি পড়ল নিজের পায়ের উপর। দেখলুম, সযত্নে কে বেঁধে দিয়েছে ক্ষতস্থানটা। পায়ে মোজা নেই, আছে পশমের

কাপড় জড়ানো। কী আশ্চর্য। পা-টা কি আর আমার নিজের নেই। কেন সাড় পাই নি এতক্ষণ।

লামা বলছিলেন : বড় ভাইটা বোঝাতে কিছু বাকি রাখে নি, কিন্তু এ মেয়েটা গেল না।

গভীর স্নেহে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন : এরাই সত্যিকার মায়ের জাত। সব-কিছু ঝড়-ঝাপটা সহ্য করে স্বামীর ক্রোধ আর আস্ফালন অগ্রাহ্য করে, সে তোমার জন্যেই রয়ে গেল। এদের পয়সা আছে, স্ত্রীর দেখাশুনোর জন্যে রেখে গেছে দুজন চাকর। তারা দিনের বেলায় সংসারের কাজ করবে, আর রাতে বন্দুক নিয়ে পাহারা দেবে।

মেয়েটি কী একটা জিজ্ঞাসা করল লামাকে। লামা এবারে তাকে বোঝাতে বসলেন। দেখলুম, বেশ ঠেকে ঠেকে কষ্ট করে বোঝাচ্ছেন তাকে। চীনদেশের লোক, তিব্বতী ভাষায় হয়তো ভাল দখল হয় নি তখনও।

পূর্বদিগন্ত থেকে অন্ধকার নামছে ধীরে ধীরে। আকাশে তারা ওঠে নি সব। নিজের চোখের তারায় রাত্রির আবির্ভাবের সঙ্কেত পেলুম। সারাদিনের জ্বালা নিবে গেছে, স্নিগ্ধ হাওয়ায় প্রলেপ লাগল প্রশান্তির।

আবছায়া আলোয় ভাল করে দেখলুম মেয়েটিকে। উচ্ছলতার দিন পেরিয়ে যৌবন স্থির হয়েছে বর্ষাশেষের নদীর মতো। পূর্ণতার ঢল আছে, ভাসিয়ে নেবার ভয় নেই। সন্তানের জন্ম না দিয়েও জননীর যোগ্যতা অর্জন করেছে স্নেহে ও নিষ্ঠায়। ছোট চোখ দুটো বড় বড় করে গভীর আগ্রহে লামার গল্প শুনছে।

পাশ থেকে পায়ের শব্দ পেলুম—তিব্বতী বুটের ধুপধাপ আওয়াজ। ও-ধারের তাঁবুর সামনের চাকর দুটো চকিতে দাঁড়িয়ে উঠেই সতর্ক হল, তারপর কী একটা আশ্বাসে আবার ঝিমিয়ে বসে পড়ল। দেখলুম, একটি যুবক অনেক সঙ্কোচে অনেক দ্বিধায় সামনে এগিয়ে এল।

আশ্চর্য হল মেয়েটি, ক্ষিপ্র পায়ে দাঁড়িয়ে উঠেই কী একটা প্রশ্ন করল উত্তেজিতভাবে। অপরাধীর মতো জবাব দিল যুবক। মেয়েটি উত্তর শুনতে শুনতে বসে পড়ল তার পুরনো জায়গায়। যুবকটি বসল খানিকটা তফাতে।

আমি প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকালুম লামার দিকে। লামার ঠোঁটের কোণায় হাসির ঝিলিক দেখলুম। বললেন: এই যুবকটি এর সেজো স্বামী, নাম ছেরিং পেন্‌ছো। এর স্বামীরা চার ভাই। বড় ভাইকে দেখেছ সকালবেলায়, যে নিতান্ত রাগতভাবে আমাদের ফেলে গেল। মেজো দেশের কারবার দেখছে। এটি সেজো, সবারই বড় অনুগত। আর ছোটটি নিতান্তই ছোট, স্ত্রীর ওপর তার দাবি অন্য রকমের। মায়ের অভাব ভুলেছে স্ত্রীকে পেয়ে। সকালবেলা তার কান ধরে বড় ভাই হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে গেছে ছেলেটা।

জিজ্ঞাসা করলুম: এ ফিরে এল কেন?

লামা তেমনই প্রসন্ন হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে বললেন: স্ত্রীর জন্যে মন-কেমন করল, তাই পালিয়ে এসেছে। শুনলে না, এর জন্যে কত ভর্ৎসনা শুনতে হল! ছোট ছেলেটা থাকতে পারল, আর সে পালিয়ে এল ভেড়ার মতো! কী জবাব দেবে বড় ভাইকে!

যুবককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মেয়েটি আবার গল্প শুনতে বসল—লামার অসমাপ্ত গল্প।

দূরে আবার ছায়ার মতন লোকজন দেখা দিল। ঘোড়া আর চমরী, বড় বড় লোমে ঢাকা ছাগল আর কুকুরের পাল। দূর থেকে পুরুষ আর মেয়ে চেনা যায় না। সবাই আলখাল্লা পরে। ছুব্বা। তাদের ছুব্বার তারতম্য বুঝি নেই। কারও মাথায় বড় টুপি, কারও বেণী দুলছে পিঠের পিছনে। অবিন্যস্ত রুক্ষ চুলের বোঝা নিয়েও আসছে অনেকে। এক সময় তারা কাছে এল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল দূরে ও নিকটে। পশুর পিঠ থেকে নামাল তাদের মালপত্র,

খুটখাট আওয়াজ উঠল তাঁবু খাটানোর। অন্যের তাঁবু দেখে এরা নিজেদের খুব ফেলে। তারাও এখানে রাত্রিবাস করবে।

চাকরেরা কাঠের পাত্রে পানীয় আনল। কড়া মদ, দেশে এর গন্ধ পেয়েছি দেশী মদের দোকানের সামনে দিয়ে যেতে। রঙিন জলেও আমার ভয়, সেই ভয়ে স্কোয়াশ খাই নে বন্ধুর বাড়িতে। মাথা নেড়ে পাত্রটি ফিরিয়ে দিলুম।

এক ভাঁড় হাতে নিয়েছিল মেয়েটি। আমাকে ফিরিয়ে দিতে দেখে সে-ই আশ্চর্য হল বেশি। কী একটা প্রশ্ন করল লামাকে। লামা নিঃশব্দে সেই প্রশ্ন সঞ্চালন করলেন আমার দিকে। বললুম : এ আমি খাই নে

লামা নিজেও খান না। যুবকটি নিজের পাত্র নিঃশেষ করেছিল। লামার মুখে আমার উত্তর শুনে ছোঁ মেরে পাত্রটা ছিনিয়ে নিল। আরও কম সময় নিল সে পাত্রটি নিঃশেষ করতে। মেয়েটি চুমুক দিল রয়ে রয়ে—গল্প করতে করতে।

চাকরেরা পাত্র নিয়ে ফিরে গেল। লামা বললেন : মেয়েটি বলছে যে, মদ না খেয়ে আমরা বাঁচি কী করে, সেই ভেবে তার আশ্চর্য লাগছে। মদই তো জীবন!

এবারে শুকনো মাংস এল। আর কী এল, বুঝতে পারলুম না। শুঁটকো গন্ধ সেই মাংসে। বললুম : আমার খিদে নেই এ বেলা।

লামা বোধ হয় নিজের জন্য চায়ের ফরমায়েশ করলেন। বললেন : আমার উপাসনার সময় হয়েছে। উপাসনা সেরে আমি একটু চা খাব।

ছেরিং পেন্‌ছোরা স্বামী-স্ত্রীতে আর এক দফা মদের সঙ্গে শুকনো মাংস খেতে লাগল ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

একটু তফাতে গিয়ে লামা উপাসনা শুরু করলেন। প্রণাম করলেন অনেকবার আর অর্ধস্ফুটভাবে আবৃত্তি করলেন অনেক কিছু।

আমার দৃষ্টি পড়ল নতুন একটি তাঁবুর দিকে। দরজার ফাঁকে মুখ বার করে একটি মেয়ে লক্ষ্য করছিল লামাকে। আমার দিকে চোখ পড়তেই লুকিয়ে ফেলল নিজের মুখখানা।

তিন

এই তিব্বত! হিমালয়-পারের অজানা দেশ! ছেলেবেলায় কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চেয়ে ভাবতুম, ওইখানেই পৃথিবীর শেষ। মৃত্যুর পরেও একটা জীবন আছে ভাবা যায়, কিন্তু হিমালয় পেরিয়ে যে মানুষ আছে তা কল্পনায় আসত না। আরও শৈশবে ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছি কৈলাসের। হিমালয়ের মেয়ে উমাকে নিয়ে সেই বরফের দেশে ঘর বেঁধেছেন ভোলা মহেশ্বর। ভূত প্রেত তাঁর অনুচর। আর তারই পাশে আছেন সকল সম্পদের অধীশ্বর কুবের। সোনা-চাঁদির মোহ ঘুচিয়ে সেই নগ্ন পাহাড়ে পৌঁছলে জগতের সকল ঐশ্বর্য আসবে হাতের মুঠোয়। লঙ্কার রাজা রাবণ এসেছিলেন সেই ঐশ্বর্যের সংবাদ পেয়ে। কিন্তু গুপ্তধনের হদিস পান নি রাক্ষসরাজ, ফিরেছেন তাঁর পুষ্পকরথ নিয়ে। তাতে আকাশে ওড়া যায়, সমুদ্রতলের মুক্তা আহরণ হয় না।

পুরাণে তিব্বতের নাম দেখেছি কিম্পুরুষবর্ষ। মানে কুৎসিত পুরুষের দেশ। অতীশ দীপঙ্কর এসেছিলেন এ দেশে। কী দেখেছিলেন তিনি জানা নেই। তবে প্রথম দর্শনেই যে স্থানের নাম রেখেছিলেন প্রেতপুরী, এখনও সে স্থান রেতাপুরী নামে পরিচিত। গ্যাকার্কো থেকে কৈলাসে যায় এই স্থান ঘুরেই। এখানকার লোককে আজও প্রেত বলা চলে কিনা, তা এখনও দেখা হয় নি।

একগাল হাসিতে সারা মুখ উজ্জ্বল করে লামা এসে পাশে বসলেন। বললেন: কী ভাবছ সকালবেলায়?

বড় স্নিগ্ধ শীতল আজকের সকালটি। কুয়াশার আবেশ কেটে যাচ্ছে। বললুম: ভাবছি এ কোন্ দেশে এলুম!

লামা হেসে বললেন : আমরাও ভাবছি, এ কোন্ জীব এল আমাদের ভিতর ?

চমকে উঠে বললুম : মানে ?

লামার হাসিতে শব্দ নেই, নিজের রসিকতায় ছোট্ট ছোট চোখ দুটো শুধু জুড়ে যায়। বললেন : দেখলে না, ঠাণ্ডা জলে যখন মুখ-হাত ধুচ্ছিলে মনের আনন্দে, নিমা কেমন হতভম্ব হয়ে তোমাকে দেখছিল। অকারণে ঠাণ্ডা জল ঘাঁটে এমন বেকুবও আছে দুনিয়ায় !

নিমা কে জিজ্ঞাসা করলুম।

লামা বললেন : তোমার আশ্রয়দাত্রীর কী নাম জান ?

বললুম : আঁনে।

কাল তার স্বামীর মুখে যেন এমনি একটি নাম শুনেছি কয়েকবার।

জিভ কেটে লামা বললেন : সর্বনাশ। এ নাম আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ ক'রো না। নিমা হয়তো তোমার অজ্ঞতা দেখে হাসবে, কিন্তু তার স্বামীরা শুনলে একখানা চকচকে ছুরি চালিয়ে দেবে তোমার পেটে। তোমার সুস্থ অন্ত্রটাকে বাইরে টেনে আনতে এতটুকু দ্বিধা করবে না।

বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন।

আমি ভয় পেয়ে বললুম : এ কি কোনও গভীর অপরাধ হল ?

লামা বললেন : অপরাধ নয় ! এ দেশের স্বামীরা তাদের স্ত্রীকে আঁনে বা আইলা বলে।

লামা বললেন : তোমার আশ্রয়দাত্রীর নাম নিমা। কোন এক রবিবারে জন্মেছে বলে বাপ-মায়ে নাম রেখেছে নিমা। সোমবারে জন্মালে নাম হত দাওয়া, কিংবা পাসাঙ নাম হত শুক্রবারে জন্মালে। শনিবারের শিশুকে তেমনি পেমবা বলে এরা ডাকে।

হেসে যোগ করলেন : অল্প দিনেই কেমন তিব্বতী ভাষা শিখেছি দেখ।

বললুম : আমি এসব শিখতে পারব না।

কিছু দূরে কয়েকটা পাখি দেখতে পেলুম। কাকের মতো দেখতে, কিন্তু রঙ কিছু সাদা, কিছু ছোটও হবে আকারে। ঠোঁট আর চোখে বোধ হয় লালের ছিটে। তাদের একটি আক্রমণ করেছে আর-একটিকে; ঠুকরে ঠুকরে মেরেই ফেলবে তাকে। বাকিগুলো দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে যেন। মনে পড়ল, পাঠশালায় পণ্ডিতমশাই যখন কোনও প'ড়োকে পড়ার জন্য মারতেন, আমরা দাঁড়িয়ে বা বসে তার নিগ্রহটুকু নিঃশব্দে উপভোগ করতুম। বন্ধু হলে দুঃখ পেয়েও চুপ করে থাকতুম।

আমার দৃষ্টি অনুসবণ করে লামা বললেন : পাখি দেখছ ? তিব্বতীরা একে ক্যাকা বলে, এই জাতের পাখিকে। সাধারণভাবে ছা মানে পাখি। ছ্যা-আ।

বলে উচ্চারণটা আমায় শিখিয়ে দিলেন।

তার পরেই বললেন : চা ব'লো না। চা মানে ইস্পাত। আবার সা বললে অন্য মানে হবে। নেভার বা কখনও নাকে আমরা সা বলি।

এই সা কিছু চা-ঘেঁষা। আমাদের দেশে পূর্ববঙ্গেব মানুষেরা যেমন চায়ের উচ্চারণ করে তেমনই।

আমি বললুম : আমরা চা খাই। টী।

চা ? স্জা ?

লামার চোখ জোড়া ছোট হয়ে এল। বললেন : সে নয়, সাও নয়, বল স্জা। জ এর মাথায় একটু চন্দ্রবিন্দুর আমেজ থাকবে।

তার পরেই বললেন : সাবধান স্ঝা ব'লো না। তিব্বতের ইগেয় ঝ নেই। ঝ কেন, ঘ ঢ ধ ভ—এ সব কঠিন শব্দ একটাও নেই। ইগে বোঝনি বুঝি ? ইগে মানে হল বর্ণমালা। চিঠিও হয়।

তিব্বতী ভাষা শিখতে আমি আসি নি, উৎসাহ পেলুম না লামার কথায়। আমার নির্লিপ্ততা লক্ষ্য করে তিনি বক্তব্যের বিষয় বদলালেন। বললেন : কাল সন্ধ্যেবেলাতেই তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, মজা দেখলে না রাতের।

আমি কথা না বলে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

লামা বললেন: কাল আমাদের পাশের তাঁবুতে একটি ছোট মেয়ে দেখেছিলে?

ছোট কি বড় জানি নে, একটি মেয়ে দেখেছিলুম মনে পড়ছে।'

লামা বললেন: ছোটই, উনিশ-কুড়ির বেশি বয়স হবে না নিশ্চয়ই। মাকে ফেলে তার বাপের সঙ্গে বেরিয়েছে। বাপের বাণিজ্য আর মেয়ের তীর্থ দুই-ই হবে একসঙ্গে। পথে বাণিজ্য দেখবে মেয়ে, আর বাণিজ্যশেষে তীর্থ করবে বাপ।

লামা হাসতে লাগলেন অর্থপূর্ণভাবে। সে অর্থ বুঝতে না পেরে আমি শূন্যদৃষ্টিতে তাকালুম তাঁর দিকে। লামা বললেন: অনেকদিন আগে এদের সঙ্গে পবিচয় হয়েছে। একসঙ্গেই আসছিলুম কিনা।

একসঙ্গে এলে পরিচয় হবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে।

লামা বললেন: আরও একটি যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। সেও বাণিজ্য করতে বেরিয়েছে।

এবারে তাঁর হাসির অর্থ খানিকটা বুঝলুম। এদের নিয়েই হয়তো একটা গল্প ফাঁদবেন। এ তারই ভূমিকা হচ্ছে।

আশেপাশের কয়েকটা তাঁবুর দিকে আঙুলের সঙ্কেত করে বললেন: ওই তাদের তাঁবু। আজ ভোর রাতে যে যার মতো তাঁবু গুটিয়ে মালপত্র নিয়ে চলে গেল। এরা পড়ে আছে। একটু বেলা বাড়লেই ব্যাপারটা জানা যাবে। মেয়েটির পেটে ব্যথা ধরেছে আজ, আর ছোকরার হাঁটু মচকেছে হঠাৎ। মিলিয়ে নিও আমার কথা।

বলে লামা হাসতে লাগলেন আগের মতো।

আমার পায়ের ব্যথা অনেক কমেছে, চোখের জ্বালাও থাকে না এ সময়টা। গল্পটা উপভোগ্য লাগবে ভেবে ভদ্র ভঙ্গিতে প্রশ্ন জানালুম: তাই নাকি?

লামা বললেন: মেয়েটির নাম সুমু আঙমা। এর বাবা ডাম গ্যা-শোর লোক। ডাম গ্যা-শো আর খাম—এ দুটো জায়গা

পাশাপাশি। সেখানকার লোকের সম্বন্ধে তোমার ধারণা কিছু থাকলে এদের নাম শুনলেই তোমার বুকের রক্ত জমে যেত।

আমি লামার মুখের দিকে চোখ তুলে চাইলুম। লামা বললেন: এদের পেশা কী জান? খুন আর ডাকাতি। কৃষিকার্য বা ব্যবসা এদের একটা খেয়াল। পশুপালন করে শখে, ধর্মকে একটা শৌখিনতা মনে করে। ঘোড়ায় চড়ে এরাও আসে ছো মাফাম্ আর খাং রিম-পোছের তীর্থ করতে। এদের ইয়াকের পিঠে শুকনো ফলমূল আর নিজেদের হৃদয়ে তাজা রক্তের লোলুপতা। এ দেশের মেয়েরাও তেমনি। একটা ছাগল কাটার সঙ্গে মানুষ খুনের প্রভেদ দেখে না এতটুকু। এ দেশে আসবার আগে শুনেছিলুম, দলে মেয়ে থাকলে এদের আশ্রয় কতকটা নিরাপদ। তিব্বতের বনে বাদাড়ে পাহাড়ে মরুভূমিতে মেয়েদের সামনে নাকি এরা মানুষ খুন করে না। কিন্তু খামের লোক দেখে সে ধারণা আমার ভেঙে গেছে।

শুনলে আশ্চর্য হবে: লামা বললেন: এদের শ্লোগান হচ্ছে—খুন না করলে খাবার নেই, আর তীর্থ না করলে পাপমুক্তি নেই। চল, এগিয়ে চল তীর্থের পথে মানুষ মারতে মারতে আর মন্দির দেখতে দেখতে।

জিজ্ঞাসা করলেন: এদের তুমি তাজা রক্ত খেতে দেখেছ? খাবার জন্যে যখন জানোয়ার কাটে, তার রক্ত ধরে নেয় বাটিতে আর চাম্পা গুলে সেই রক্ত খায় পরম পরিতৃপ্তিতে। চাম্পা বোঝ?

উত্তর নিজেই দিলেন, বললেন: চাম্পা হল বার্লির ছাতু, কাল দইএর সঙ্গে যা খেলে।

তাঁরই চোখের সামনে অঞ্জলি ভরে কেউ রক্ত পান করছে, এমনই কোনও বীভৎস দৃশ্যের কল্পনায় লামা চোখ বন্ধ করলেন। প্রচণ্ড ঘৃণা ফুটে উঠল তাঁর কপালের রেখায়। বললেন: এরাও নিজেদের বৌদ্ধ বলে।

দেখতে পেলুম, গল্পের খেই হারিয়ে ফেলেছেন লামা। দুটি তরুণ-

তরুণীর প্রণয়ের কাহিনী শোনাতে শুরু করে অধর্মাচরণের গ্লানিতে তিনি ক্লিষ্ট হচ্ছেন।

তাঁকে তাঁর গল্পের ভিতর টেনে আনবার জন্য বললুম: ছেলেটির কী নাম?

লামা সম্বিৎ ফিরে পেলেন, বললেন: ওয়াঙ ডাক। সুমু আঙমা বলে, ও ছোকরা বাণিজ্য করতে আসে নি, তীর্থের টানেও না। তার লোভের কথাও অব্যক্ত রাখে নি সুমু আঙমা। কিন্তু লোভ দেখালেই তো গলা বাড়িয়ে দেওয়া যায় না! ওই ছোটলোক গুণ্ডাকে বিয়ে করবে কে? ও ছোকরার আছে কী? হেসে গড়িয়ে পড়ে জানিয়েছিল তার দুর্দশার কথা। মাস কয়েক আগে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন নিয়ে তাদের বাড়ি এসেছিল বিয়ের প্রস্তাব করতে। তারা খবর পেয়ে আগে ভাগেই দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। দিন চারেক তারা দরজায় ধরনা দিয়েছে। যত ইট পাটকেল আর ঘুঁটের ঢিল খেয়েছে, তার চেয়ে বেশি খেয়েছে গালি-গালাজ। বাড়ির বাহিরে কেউ বেরলেই তার হাত-পা ধরে খোশামোদ করত ইনিয়ে-বিনিয়ে। ভেবেছিল, এসব স্ত্রী-আচারের পর দরজা খুলে তাদের ভিতরে আনবে। কিন্তু কে রাজী হবে ওই ছোটলোকটাকে বিয়ে করতে? সুমু আঙমা? সুমু আঙমার যে রূপ, তাতে সে যে কোনও লামাকে ভুলিয়ে সংসারী করতে পারে। ঐ ছোট জাত ওয়াঙ ডাকের কী আছে! না পয়সা, না প্রতিপত্তি। অমন সাধারণ মানুষকে বিয়ে সে অনেক দিন আগেই করতে পারত। কুড়ি বছর তো তার ঢের দিন পেরিয়েছে।

লামা বললেন: সুমু আঙমার দরজা থেকে বিফলমনোরথ হয়ে ওয়াঙ ডাককে ফিরিয়ে নিয়ে গেল তার দলের লোকেরা। অত নির্যাতন তাদের সহ্য হল না। সুমু আঙমা বলে, কী নির্লজ্জ ওই ওয়াঙ ডাকটা! এমন অপমানের পরেও প্রেম করতে আসে! লোকের কাছে নাকি বলে, সুমু আঙমা তাকে ফেরাবে না কিছুতেই, তার ধৈর্যের পরীক্ষা করছে শুধু। সুমু আঙমা আজকাল ঘেন্না করে ওয়াঙ ডাককে।

কৌতুকে উজ্জ্বল হল লামার স্মিত মুখখানি। বললেন: আমার বয়স কত মনে হয়?

পঞ্চাশ

কিছু বেশিই হবে।

হেসে যোগ করলেন: আমার মতো একজন লামা পেলে সে নাকি এখুনি বিয়ে করে! বাপের এক মেয়ে সে, অগাধ তাদের সম্পত্তি। দেড় শো ইয়াক আর সাড়ে তিন শো লু। চমরী আর ভেড়া। বলতে গেলে ডাম গ্যা-শোর রাজাই তারা। এমন অনেক ছোকরা লামা আছে দেশে, যারা তাকে পেলে ধন্য হবে কিন্তু সে সব লামাকে তার পছন্দ হয় না। তারা মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়, বেফাঁস কথা বলে, আর জীবন পরিপূর্ণ ভাবে চাছাং পেম্মায়। চাছাং পেম্মা বোঝ?

জবাব নিজেই দিলেন, বললেন: ছাং মানে দিশী মদ। পেয়ালার পর পেয়ালা গিলে বেহুঁশ হবার নাম চাছাং পেম্মা। এর বাড়া সুখের স্বপ্ন এদের জানা নেই। কিন্তু সুমু আঙমার বিশ্বাস, শাক্যমুনির নতুন জন্ম হবে তারই ঘরে। সেই পরম ক্ষণের জন্য তার নিঃস্বার্থ প্রস্তুতি। চীনের লামাদের কথা সে অনেকবার শুনেছে। মন প্রাণ দিয়ে তারা শাক্যমুনির আশীর্বাদ চায়। অমন একজন লামার জন্যে সেও তার মন প্রাণ দিতে পারে।

নিমা আমাদের চা নিয়ে এল। বড় নোংরা বাটি। আগের দিনের চায়ের দাগ গায়ে লেগে আছে। কারও এঁটো বাটিতে খাচ্ছি বলে গা ঘিনঘিন করে উঠল। লামা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে অভয় দিলেন: কিছু চিন্তা ক'রো না। আমাদের জন্যে আলাদা বাটি আছে। তাতে আমরাই শুধু খাচ্ছি। চাকরদের অন্য ব্যবস্থা।

এরা পেয়ালা ধোয় না?

নিমাকে লামা কী প্রশ্ন করলেন। তার উত্তর শুনে বললেন: আমার আস্তিনে তোমার পেয়ালাটি পরিষ্কার করেই চা ঢেলেছে।

সর্বনাশ! অমন নোংরা আস্তিনে আমার চায়ের বাটি মুছেছে!

লামা হেসে বললেন : তুমি অত খুঁতখুঁতে কেন বল তো? বেশ তো পরিষ্কার তোমার পেয়ালাটি। স্বজা সে। নাও, চা খাও।

রসিকতায় লামা উচ্ছল হলেন।

খানিকটা দূরে এক খণ্ড পাথরের উপর বসে চাকরদের একজন তার লামখো জোড়া মেরামত করছিল। চমরের চামড়ার জুতো। এক টুকরো চামড়া জলে ভিজান ছিল, তাই নরম করে ছেঁড়া জায়গায় তালি দিচ্ছে।

সকালে উঠে অবধি নিমার স্বামীকে দেখতে পাই নি। লামাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করলুম। লামা বললেন : ছেরিং পেনছোর কথা বলছ? সন্ধ্যেবেলায় তাকে দেখতে পাবে।

নিমা এবাবে তার নিজের চা নিয়ে কাছে এসে বসল।

লামা বললেন : শেষরাতে নিমা তাকে তাড়িয়েছে। নেহাত শীতের অন্ধকার, তাই রাতে তার তাঁবুতে থাকতে দিয়েছিল। দিন হলে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করত।

কেন বিদেয় করল জানতে চাইলুম।

লামা বললেন : পুরুষমানুষ অমন মেয়েমুখো হবে কেন? বাণিজ্য করতে বেরিয়েছে তারা, স্ত্রীর জন্যে নিজেদের কাজ ভুলবে? বড় ভাইকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসতে লজ্জা হল না তার?

রাতে অভিমানে গুমরেছে ছেরিং পেনছো! নিমা তার টুকটুকের ভাগ স্বামীকে না দিয়ে গোটা টুকটুকখানাই দিয়েছিল তোমার গায়ে। তুমি তখন ঘন হয়ে ঘুমচ্ছ, সেই স্নেহের স্পর্শ পেলে না। যে বঞ্চিত হল, সে অপমানে অভিমানে শেষরাতেই বেরিয়ে গেছে।

হেসে বললেন : বেশি দূর যায় নি। সন্ধ্যার আগেই যে সে ফিরে আসবে তাতে নিমার সন্দেহ নেই।

এই হাড়-কাঁপানো শীতের রাজ্যে এ দু রাত এমন পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে কী করে ঘুমিয়েছি, সে রহস্য উদ্ধার হল লামার সংবাদে। নিমার

টুকটুকখানা আমি ফিনের মেলায় দেখেছি। ক্যাম্বিসের মতো মোটা কাপড়ের লেপ, সের বারোর কম ওজন নয়, তাতে আবার লু এর লোমের আস্তর। লু হল ভেড়া। ওজন যত, গরমও তত, তার চেয়েও বেশি দুর্গন্ধ। জেগে থাকলে ওখানার অভাবই বেশি আরাম দিত।

ওপাশের তাঁবু থেকে এক ভদ্রলোক এলেন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল তামাটে গায়ের রঙ, মাথায় টুপি। গায়ে পশমের ছুববা আর পায়ে হাঁটু অবধি উঁচু লামখো। লামাকে ডাকতে এসেছিলেন।

লামা সব শুনে আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: সুমু আঙমা পেটের ব্যথায় আজ উঠতে পাচ্ছে না। যাই, একবার দেখে আসি।

ভদ্রলোকের চোখে কৃতজ্ঞতার আভাস পেলুম, কী বললেন বুঝতে পারলুম না।

লামারা চলে যেতেই এক যুবক এসে কাছে বসল। রুক্ষ চেহারা, কঠিন মুখশ্রী, টুপিহীন মাথায় চুল বেণীবদ্ধ। নিমাব পাশে বসে নিমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল নিজেদের ভাষায়। এ যে তার সেজো স্বামী নয় তা বুঝতে পারছি। কিন্তু পরিচয় জানবারও উপায় নেই। লামার কথা মনে পড়ল। বোধ হয় সুমু আঙমার পাণিপ্রার্থী সেই যুবকটি হবে।

নিমাকে দেখলুম ভাল করে। বয়স এমন কিছু নয়, অযত্নে ও অবিন্যাসে তার সহজ লাবণ্য হতশ্রী হয়েছে। মুখের তামাটে রঙের উপর আর একটা রঙের প্রলেপ। কী একটা লাল নির্যাস ব্যবহার করেছে। প্রথমে ওটা প্রসাধন ভেবেছিলুম। পরে লামার কাছে জেনেছি, সেটা এক রকম ওষুধ। রুক্ষ পাহাড়ী-দেশে বরফের উপর সূর্যকিরণ পড়ে চোখে যে জ্বালা ধরায়, এই নির্যাস তাতে আরাম দেয়। চোখের ফোলা আর জল-পড়াও কমে এই ওষুধে। কিন্তু এর বীভৎসতা আছে। সুশ্রী নারীকেও ভয়ঙ্করী মনে হয়।

নিমার মাথার চুল পরিপাটী করে বাঁধা, তার উপর নানা অলঙ্কার। আমাদের দেশের মেয়ের মতো সোনা-রূপোর কাঁটা নেই; আছে সাদা আর লাল রঙের প্রবাল, শামুক আর কড়ির মালা। গলা থেকে ঝুলছে একটা চারকোণা কবচ আর গোটাকয়েক ভারতীয় টাকা।

মিমার হাসি দেখলুম। দুর্ভাবনাও দেখলুম তার মুখে। কী একটা কথায় আতঙ্কে বেগনি হয়ে গেল।

এক সময় অতর্কিতে অন্তর্হিত হল যুবকটি। এমন অকস্মাৎ ঘটল যে, কোথায় লুকল, দেখতে পেলুম না। একটু পরেই তার কারণ জানা গেল। সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে কইতে লামা ফিরে এলেন। তাঁর মুখের হাসি কিন্তু এতটুকু ম্লান হয় নি।

ভদ্রলোক কী একটা অনুরোধ করে ফিরে গেলেন। লামা গল্প শোনাতে বসলেন আমাকে।

সুনু আঙমার বাবা ডাকতে এসেছিলেন। পেটের ব্যথায় মেয়েটা সকালবেলাতেই এমন কাতর হয়ে পড়ল যে আজ আর যাওয়া হল না। ভারি ভোগে নাকি মেয়েটা। কিন্তু এবারের রোগটা : লামা হেসে বললেন : পেটের নয়, মনের।

কী ওষুধ দিলেন?

ওষুধ কি আর আমার সঙ্গে আছে, না ওষুধ দিতেই জানি! একটু লবঙ্গের তেল আছে, হাড়ের কাঁপুনি অসহ্য হলে গায়ে মাখি। আর একটু হোটান, তেষ্টার সময় জল না পেলে এক চিমটি মুখে ফেলি।

তবে কী করলেন?

লামা হেসে বললেন : তার সুমতি হোক—বুদ্ধের কাছে এই প্রার্থনা জানালুম।

ভদ্রলোক কী জানিয়ে গেলেন জানতে চাইলুম।

লামা বললেন : আবার আসতে অনুরোধ করলেন। তাঁর আদরের মেয়ে চোখের সামনে কষ্টে ছটফট করবে, এ তাঁর সহ্য হয় না।

নিমাকেও শোনালেন এ গল্প। নিমাইও শোনালেন কিছু। লামার মুখের হাসি তাতে মিলিয়ে গেল না, বেগনি হল না তাঁর মুখের রঙ। আমাকে বললেন : এ খবর তাঁর জানা।

কী খবর ?

ওয়াঙ ডাক এখানেই আছে। শাসিয়ে গেছে যে সুমু আঙমাব সঙ্গে বেশি হৃদ্যতা করলে আমার মঙ্গল নেই।

ভয় পান না আপনি ?

পাই বৈ কি। কিন্তু সে আর একজনকে, ভালবাসিও তাঁকে। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পায়ে প্রার্থনা জানাই যে, পথ চলতে যেন পথ হাবিয়ে না ফেলি। সেই মৃত্যুকে আমার ভয়।

সাঙ্গেলা ছিব্ গিউ নাঙ্গো।
টাশী ডিলে ফুন্ সুম্ ছোগ্।

লামা সুর করে বললেন শেষের পদ দুটি। গানের এই কলিটি তাঁর কণ্ঠে আরও অনেকবাব শুনেছি। একদিন তার মানে বলেছিলেন আমাকে। - হে বুদ্ধদেব, অপার তোমার মহিমা। আবার তুমি আমাদের ভিতর এস।

আকাশে বোদ প্রখব হতে শুরু করেছে। আজও কি আমাব চোখের জ্বালা যাবে না !

চার

আমাদের তাঁবু থেকে খানিকটা দূরে আর একটা তাঁবুতে লোকজনের আনাগোনা দেখছিলুম ঘন ঘন। কয়েকটা বাঘা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। নতুন লোক দেখলেই লাফিয়ে উঠে ঘেউ ঘেউ করে তাদের আদর-অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। কাল সারাদিন একটা থমথমে ভাব লক্ষ্য করেছি। কেউ বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমাদের লামাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করলুম।

তুমি জান না!

লামা আশ্চর্য হলেন।

আমার জানবার কথা নয়। তাই জবাব না দিয়ে নিজের প্রশ্ন বিস্তার করে দিলুম চোখের দৃষ্টিতে।

লামা বললেন: আজ তিন-চাব দিন হল একজন মারা গেছেন ওই তাঁবুর ভেতর। শক্ত সমর্থ জোয়ান লোক। বলছে, ভুগছিল কিছুদিন থেকে।

লামার চোখে অবিশ্বাসের ইঙ্গিত দেখলুম। বললেন: আমার কাছে এসেছিল বিধান নেবার জন্যে। কিন্তু এদের বিধান কি আমি দিতে পারি!

বলে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। ছোট চোখ দুটো তাঁর একেবারে বুঁজে এল।

বুঝতে পারলুম, কোন মজার গল্প শোনাবেন, এ তারই ভূমিকা হচ্ছে। তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য প্রশ্নটা জানিয়ে ফেললুম: অদ্ভুত আচার বুঝি এদের?

অদ্ভুত বলে অদ্ভুত, মুখের কথা লামা কেড়ে নিলেন: এমন অদ্ভুত কথা জীবনে কখনো শোন নি।

জগতের সমস্ত অদ্ভুত কথা জানি, এমন অহঙ্কার তো আমার নেই। তাই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

লামা বললেন : তোমাদের শাস্ত্রে আছে পঞ্চভূতের কথা—ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম। এই পঞ্চভূতে তৈরি জীব-শরীর মৃত্যুর পরে পঞ্চভূতেই বিলীন হবে। এই সূক্ষ্ম অনুভূতির কথাকে এরা শব্দার্থে গ্রহণ করেছে।

হেসে বললেন : মৃতদেহ এরা পাঁচ রকমে সৎকার করে। তালে লামা পেনছেন লামা প্রভৃতি বড় বড় লামাদের দেহ একটা বাক্সের ভেতর পুরে নুনের পুরু প্রলেপ দিয়ে কোন মন্দিরে তিন মাস রেখে দেয়। জীবিত অবস্থায় যত পুজো এঁরা পেয়েছেন, মরেও তা থেকে বঞ্চিত হন না। তিন মাস পরে বাক্স খুলে দেহটা যখন বার করা হয়, শরীরের সমস্ত রস তখন নুনে টেনে নিয়েছে। সেই নিরস দেহটা তখন শিল্পী-লামাদের হাতে পড়ে। তোমাদের দেশে খড়ের ওপর মাটির প্রলেপ দিয়ে শিল্পীরা যেমন দেবমূর্তি গড়ে, এরাও তেমনি কাদার সঙ্গে চন্দন মিশিয়ে দেহটাকে আরও সজীব করে তোলে। তার পর মনের মতো রঙ চড়িয়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে দেবতার মতো। এদেশে এমন মন্দির নানা জায়গায় আছে।

জিজ্ঞাসা করলুম : এই সৎকারকে পঞ্চভূতেব কোন্ ভূতে—

কথা শেষ করতে দিলেন না লামা, বললেন : মুশকিলে ফেললে। মাটি চড়িয়েছে বলেই তো একে ক্ষিতিতে লীন বলতে পারি নে। বরং একে ব্যোমপ্রাপ্ত বলতে পার দেহটা শূন্যে মিলিয়ে না গিয়ে শূন্যে ঝুলে রইল।

বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন। মৃদু মৃদু।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললেন : কী অদ্ভুত এদের যুক্তি দেখ। কবর-দেওয়া সৎকারকে এরা গভীর পবিতাপের চোখে দেখে। ভাবে, আত্মার তাতে মুক্তি হল না। দেহটা যদি পৃথিবীতেই পড়ে রইল,

তবে নরক হবে মৃতের আত্মার। বড় বড় লামার ব্যাপারে এ বিশ্বাস তারা কী করে ভোলে, সেই কথা ভেবে আশ্চর্য হই।

মিশরের মমির কথা মনে পড়ল। দীর্ঘদিন আগে তারা রাজা-রাজড়ার দেহ রক্ষা করত এমনই এক অদ্ভুত কৌশলে। সে অজ্ঞাত কৌশল আজও সভ্যজগতের বিস্ময় উদ্রেক করে আসছে।

লামা বললেন: আর চার রকম সংকার জনসাধারণের জন্যে। লামারা অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা দেন। তেজ মানে অগ্নিতে দাহ করার প্রথা বড়লোকদের জন্যে। এই রুক্ষ পাথর আর বরফের দেশে এত কাঠ আসবে কোথা থেকে! ইয়াকের গোবরের ঘুঁটে দিয়ে কি রসপুষ্ট ভারি ভারি তিব্বতী দেহ পোড়ানো সম্ভব! যা সকলের পক্ষে সম্ভব, সেটা হচ্ছে ক্ষিতি মানে মাটির নিচে কবর দেওয়ার প্রথা। এরা তা গ্রহণ করতে পারেনি। বসন্তরোগে মারা গেলে সেই দেহকেই এরা কবর দেয়। রোগের বীজাণু ছড়াবে না বলেই কি এই নিয়ম এ দেশে প্রবর্তিত হয়েছে! শুধু একটা অন্ধ সংস্কার এই কবর দেবার প্রথাকে ঘৃণা করে দুটো পাশবিক প্রথার প্রচলন করেছে সারা তিব্বতে।

গভীর ঘৃণায় দু চোখ মুদ্রিত করে বললেন: নিকটে স্রোতস্বিনী নদী থাকলে মৃতদেহকে এরা খণ্ড খণ্ড করে কেটে জলে ভাসিয়ে দেয়। চোখের সামনে প্রিয়জনের দেহ এরা টুকরো টুকরো করে কাটে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: বুদ্ধ এদের ক্ষমা করুন।

বৃদ্ধকে আবার গল্পের ভিতর টেনে আনবার জন্য বললুম: আপনি বিধান না দিয়ে এদের ফিরিয়ে দিলেন কেন?

উত্তর দিতে লামার বিলম্ব হল না। বললেন: আমি বৌদ্ধ। জীবের দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে তার হাড় থেকে মাংস আলাদা করে শকুন দিয়ে খাওয়াও—এমন বিধান দিতে পারব না সুস্থ মাথায়। উঃ, কী ভয়ঙ্কর!

অপরিসীম ঘৃণায় বৃদ্ধ শিহরে উঠলেন। চোখের সামনে সেই

বীভৎস দৃশ্য ঘটছে, এমনই একটা আতঙ্কে চোখ দুটো তাঁর বন্ধ হয়ে গেল। আমার মুখেও কথা যোগাল না।

এক সময় লামা বললেন: ভাবছ, বাড়িয়ে বলছি এদের বর্বরতার কথা। বুদ্ধ জানেন, আমি মিথ্যা বলি না। এ দেশের সর্বত্র প্রচলিত ও সবচেয়ে আদৃত প্রথাই হল এই মরুৎ মানে আকাশে সৎকারের প্রথা। যে খেচরের বাস আকাশে, নিঃশেষে তাদের দিয়ে খাওয়ানোই যুগ যুগ ধরে পরিতৃপ্তি দিয়ে আসছে এই মানুষ নামের --

কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না।

একটু থেমে বললেন: বিশ্বাস করবে, এ দেশের লামারাও এই কাজের সময় সঙ্গে থাকেন? জল্লাদ দেহটাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলবার পর আত্মীয়বন্ধুদের এঁরা সাহায্য করেন হাড় থেকে মাংস আলাদা করতে, আর শক্ত হাড়গুলোকে পাথর দিয়ে গুঁড়ো করতে। চারিদিক ঘিরে শকুনরা মাংস খাচ্ছে, আর মানুষগুলো তাদের রক্ত আর মাংস-মাখা হাতে চা আর ছাতু খাচ্ছে ঘন ঘন। এরা বলে, এই মাংস-মাখা হাতের খাবার, অপূর্ব তার আস্বাদ! এদের তুমি মানুষ বল?

লামা জিজ্ঞাসা করলেন: মানুষখেকোর সঙ্গে এদের পার্থক্য দেখবে না। আজ এই সৎকার দেখে এস। তারপর বুঝতে পারবে, পুরাকালে এদের রাক্ষস কেন বলা হত! আজও তাদের সেই আদিম প্রবৃত্তির এতটুকু পরিবর্তন হয় নি।

এখানে আমি একান্তভাবে শ্রোতা। শোনবার জন্যই কান পেতে আছি। লামা বললেন: এদের শ্মশান নিশ্চয়ই দেখনি।

দেখি নি স্বীকার করলুম তৎপরভাবে।

লামা বললেন: পাহাড় দিয়ে ঘেরা একখানা উঁচু পাথর, যার ওপরটা সমতল। চারিদিকের পাহাড়ে কাতারে কাতারে শকুন বসে আছে উদগ্র দৃষ্টি মেলে। সৎকারক্রিয়া শুরু হতেই শকুনগুলো উড়ে

এসে পাথরের ওপর জুড়ে বসবে, আর ছুটোপাটি করে মাংস খাবে, আর খাবে রক্ত দিয়ে মাখা হাড় আর ছাতুর পিণ্ড।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। সঙ্গীতের সভায় বিশুদ্ধ ধ্রুবপদী সঙ্গীত হয়ে গেল। এর পরেই হঠাৎ আধুনিক গান ভাল লাগবে কি?

আমাদের দেশের অগ্নি-উপাসক পার্সীদের সম্বন্ধে গল্প শুনেছিলুম ছেলেবেলায়, তাদের টাওয়ার অব সাইলেন্সের গল্প। সত্য কি মিথ্যা তা দেখা নেই বলে চুপ করে গেলুম।

সেই তাঁবুটার সামনে তখন আনাগোনা বেড়েছে। দু-একজন লামাকেও দেখতে পাচ্ছিলুম। দুজন লোক দুখানা লম্বা কাঠ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কী কাজ করছিল। একটু নজর করে দেখলুম, পায়াহীন একটি খাটিয়ার মতো তৈরি করছে। নিতান্ত সরু। মাথার ও পায়ের দিকে দু টুকরো কাঠ বেঁধে দড়ি দিয়ে খাটিয়াটা বুনছে। একটা প্রশ্ন এল মনে। জিজ্ঞাসা করলুম: মৃতদেহ কতদিন এরা ফেলে রাখে?

লামা উত্তর দিলেন গম্ভীর গলায়, বললেন: যতদিন না লামারা ব্যবস্থা দিচ্ছেন। দিনক্ষণ তাঁরা দেখে দেবেন। শুভদিনে ও শুভক্ষণে মৃতদেহ তাঁবুর বাইরে বেরবে। তা সাধারণতঃ তিন চার দিন পরে। এ দেশের আবহাওয়ায় মড়া পচে না, এই রক্ষে।

একজন সুগঠিত দেহ ছোকরা লামাকে দেখছিলুম। হাতে একখানা বই নিয়ে অত্যন্ত তৎপরভাবে ভিতর-বার করছে।

খাটিয়ায় একখানা সাদা কাপড় বিছিয়ে দুজনে ধরাধরি করে মৃতদেহ এনে তার উপর শোয়াল। এদের একজনকে সুন্দু আঙমার বাপ বলে চিনতে পারলুম। বড় বিমর্ষ দেখাচ্ছিল তাঁকে। আর একজন এগিয়ে এসে আর একখানা সাদা চাদরে মৃতের আপাদমস্তক ঢেকে দিল। ছোকরা লামাকে লক্ষ্য করলুম, সেই বই থেকে কিছু পাঠ করে শোনাচ্ছে।

বৃদ্ধ লামা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন অন্য দিকে। সুন্দু আঙমা

তার তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে এই সব লক্ষ্য করছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলুম, সেটা স্থির হয়ে আছে ছোকরা লামার উপর। বই থেকে মুখ তুলে ছোকরা লামাও সেদিকে মাঝে মাঝে দেখছে।

এক সময় যাত্রার সময় হল। দুজন দু দিকে ধরে খাটিয়া তুললেন। আমাদের দেশের মতো চারজন লাগল না। সুন্নু আঙমার বাপকে দেখলুম মাথার দিকে ধরেছেন।

জন তিনেক বাজিয়ে ছিল দলে। করতাল আর নাকাড়া বাজিয়ে তারাও সঙ্গে গেল।

সবাই গেল। গেল না সেই ছোকরা লামা। আমাদের বৃদ্ধ বললেন : এখানেও কিছু ক্রিয়া আছে লামার, তারই জন্যে বোধ হয় রয়ে গেল।

আমার সন্দিগ্ধ মন। আমি আমার দৃষ্টি ফেরালুম না সুন্নু আঙমার উপর থেকে। লামা জিজ্ঞাসা করলেন : একটা জিনিস তুমি লক্ষ্য করেছ ?

কোন্‌টা বলতো ?

এই যুবকটির মৃত্যুতে সুন্নু আঙমার বাপকে বেশ বিচলিত দেখা গেল। মনে হচ্ছে, তারা একই স্থানের লোক। অথচ ওয়াঙ ডাক একবারও এল না।

আপনি তাতে কি কিছু সন্দেহ করছেন ?

সন্দেহ নয়, কেমন বিসদৃশ ঠেকছে ব্যাপারটা। আর সন্দেহ করলেও কোন দোষের হবে বলে মনে করি না।

একটু ভেবে বললেন : আচ্ছা দাঁড়াও, একটু যাচাই করে দেখি।

বলে নিমাকে ডাকলেন। বললেন : সুদেন্‌ জা। বোস।

নিমা কাছেই ছিল। এগিয়ে এসে লামার কাছ ঘেঁষে বসল।

অনেকক্ষণ কী কথাবার্তা হল দুজনের। মৃদু মৃদু হাসছিলেন লামা, তারপর আমায় বললেন : দেখলে তো, যা সন্দেহ করেছি তাই। সুন্নু আঙমার বাবা ওই ছেলেটির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন স্থির

করেছিলেন। মেয়ে রাজী হলে এতদিনে বিয়ে হয়েই যেত। শুধু তার মতের অভাবেই বিয়ে হয় নি।

আমি তখন সুমু আঙমাকে লক্ষ্য করছিলুম। এইটুকু সময়ের মধ্যেই সে ওই ছোকরা-লামার সঙ্গে পরিচয় জমিয়ে ফেলেছে। মনের আনন্দে তাকে নানান গল্প শোনাচ্ছে।

বৃদ্ধ বললেন: এ দেশে কিছুই বিচিত্র নয়, বুঝলে? একটা সুস্থ মানুষ হঠাৎ মরে গেল, তার জন্যে কারও মাথা-ব্যথা নেই। ঘুমের ঘোরে কেউ গলা টিপে দিল, কি খাবার সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিল—এ তথ্য নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে মৃত্যু,। সেটাকে সহজভাবে মেনে নেওয়াই এদের ধর্ম। এই শিক্ষাই এরা পেয়েছে তাদের পূর্বপুরুষের কাছে। তারপর যেদিন কোন চক্রান্ত ধরা পড়বে, সেদিন আর একটা লোক মরবে। সে মৃত্যুকেও তারা এমনি সহজভাবে নেবে।

নিমা গভীর আগ্রহে আমাদের কথোপকথন শোনে। এক এক সময় সন্দেহ হয়, বুঝি সব কিছুই সে বুঝতে পারছে।

বাতাস তখন দুরন্ত হয়ে উঠেছে। চোখ জ্বালা করছে। বাতাসে উত্তাপ পাচ্ছি, কিন্তু তাঁবুর ভিতরে যাবার উৎসাহ পাচ্ছি না। সুমু আঙমা কথা বলছে ছোকরা লামার সঙ্গে। তার বাপ নেই তাঁবুতে। তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব যেন আমাদের উপর দিয়ে গেছে, এমনি কর্তব্যবোধ নিয়ে বাইরে বসে রইলুম।

আমি সুমু আঙমার দিকে লামার দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম। তাদের খুবই অন্তরঙ্গ দেখাচ্ছে। লামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: বুদ্ধ একে সুবুদ্ধি দিন।

আমি বললুম: কেন এমন কথা বলছেন?

লামা বললেন: বড় সরল নিরপরাধ এই মেয়েটা। একটা অদ্ভুত বিশ্বাস এমন দৃঢ় হয়েছে তার অন্তরে যে, চরম ক্ষতি করতে পারে এই সব ছোকরা লামা। এদের সম্বন্ধে অনেক শুনেছি, দেখেছিও কিছু

এরা পারে না এমন কুকর্ম নেই। এ কথা আমাকে অনেক দুঃখে বিশ্বাস করতে হয়েছে।

একটু সজাগ হয়ে আবার বললেন: কিন্তু এরাই সব নয়। এ দেশেও আছে এমন পণ্ডিত মহাপুরুষ, যাঁরা সারা বিশ্বের নমস্য হবার যোগ্য।

তেমন লোকের সাক্ষাৎ কি আপনি পেয়েছেন?

মাথা নেড়ে লামা বললেন: না, পাই নি। কিন্তু এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করার মতো প্রমাণ পেয়েছি।

নিঃশব্দে আমি আমার প্রশ্ন সঞ্চালন করে দিলুম।

লামা বললেন: প্রকৃত সত্যসন্ধানীব সাক্ষাৎ পেয়েছি এ দেশে। সর্বত্যাগী নিবহঙ্কার জ্ঞানী পুরুষ, মুক্তির জন্যে তপস্যা কবেছেন লোকচক্ষুর আঁড়ালে। লোকালয় থেকে দূরে পর্বতের গুহায় তাঁদের বাস।

একটু থেমে বললেন: পথ চলার সময় এই কথা মনে রেখো, নিজেই অনেক মহাপুরুষ আবিষ্কাব করবে।

আমি তখনও লক্ষ্য করছি সুন্নু আঙমাকে। এতগুলো চোখের দৃষ্টিব সামনে হঠাৎ কেমন অপ্রতিভ হল মেয়েটা। ছোকরা লামাকে ডেকে নিজেব তাঁবুর ভিতবে চলে গেল।

নিমা লামাকে কী একটা সংবাদ দিল। লামা আমাকে সে সংবাদটুকু দিলেন। বললেন: কয়েকদিন থেকে এই ছোকরাটি সুন্নু আঙমার কাছে ঘোরাঘুবি করেছে। নানান ওষুধ দিচ্ছে, আর ঘন ঘন ঝাড়ফুঁক করছে। তার বাপেব বিশ্বাস নেই এদের ওপর। তাই সকালবেলায় আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

হেসে বললেন: সুন্নু আঙমার পেটের ব্যথা আজ নিশ্চয়ই কমেছে। কাল সকালেই তা হলে যাত্রা করবে। ওয়াঙ ডাক তার হাঁটুতে তেল মালিশ করাচ্ছে। খবর পেলে সেও কাল সোজা হয়ে দাঁড়াবে।

বললুম: আমিও আজ সুস্থ বোধ করছি।

রসিকতাটুকু ধরতে পেরে হাসিতে লামার ছোট চোখ দুটো একেবারে বুজে এল।

ঝড়ের মতো বাতাস বইছে বাহিরে। পতপত করে উড়ছে তাঁবুর কাপড়। মনে হচ্ছে, খুঁটি ও দড়িদড়াসুদ্ধ তাঁবুটা উড়ে যাবে। এ কদিন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছি দুপুরবেলায়। আজ বুদ্ধি কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। দেহের অনাবৃত অংশ ফেটে জ্বালা করছে, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে উঠছে বার বার।

আবার জল চাইলুম। নিমা পাশের তাঁবু থেকে জল এনে খাওয়াল।

কোথা থেকে এই অশান্তি আসছে, শুয়ে শুয়ে তাই ভাবতে লাগলুম। পায়ের যন্ত্রণা বেশ সেরে এসেছে, চলতে আর কষ্ট হচ্ছে না। চোখের জ্বালাও নেই আগের মতো। গাঢ় লাল রঙে নিমা চিত্রিত করে দিয়েছে মুখখানা, কোল্ডক্রীম মাখার আরাম পেয়েছি তাতে। এদের খাবারেও অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছি। তৃপ্তি না পেলেও গা আর ঘুলিয়ে ওঠে না। চায়ে তো এদের জাদু আছে। সকাল-সন্ধ্যেয় কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় যখন কাঁপুনি লাগে দেহে, চায়ের জন্য শিহরণ জাগে শিরায়।

আজ সকালে নিমা যখন চা তৈরি করতে গেল পাশের তাঁবুতে, আমি তার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলুম। চাকে যে এরা স্তজা বলে, তা শিখে ফেলেছি। লামা বলেন, ইংরেজীতে লেখে সোলচা। ইটের থামের মতো এদের চায়ের থান আসে চীনদেশ থেকে। জলে সিদ্ধ করে তা থেকে এরা খানিকটা কড়া নির্যাস বার করে নেয়। সেই নির্যাসে নুন আর প্রচুর মাখন ফেলে একটা দু হাত লম্বা চোঙার ভিতর ঢেলে দেয়। একটা পিস্টন এই চোঙায় আঁটা, দু হাতের জোরে সেটাকে পিচকারির মতো উপর-নিচ করতে হয়। তবেই সব জিনিসগুলো ভাল করে মিলে খাবার উপযোগী হয়। তিব্বতী মেয়ে বলেই পারে। আমাদের দেশের মেয়েদের এত শক্তি আছে বলে মনে হয় না।

একসময় বৃদ্ধ লামাও আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে নিমা কী একটা কথা বলল। বিস্মিত হলেন লামা, বললেন : কী আশ্চর্য দেখলে! এই যন্ত্রের শব্দ শুনে নিমা বলছে, আজকের স্তুজা তত ভাল হবে না।

আমিও বিস্মিত হলুম।

আমার মুখের ভাব দেখে নিমা আরও কিছু বলল। শুনে লামা বললেন : নিমা বলছে যে এ আর এমন শক্ত কাজ কী! যে কোন ভাল গিন্নীই এ কথা বুঝতে পারে।

ভারি অদ্ভুত মনে হয় আমাদের। তৈরি করার শব্দ শুনে চায়ের আস্বাদ বোঝা যায়! আশ্চর্য লাগবারই কথা।

লামা বললেন : এরা শৌখিন বটে।

নিমার চা তৈরি শেষ হয়েছিল। আমার মনোযোগ তখন চায়ের বাটির দিকে গেছে। তা লক্ষ্য করে লামা বললেন : বাটিটা ধুয়ে নেবার ইচ্ছা, এই তো!

আমার ঠোঁটে একটু হাসিব রেখা লক্ষ্য করে বললেন : দাঁড়াও, সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

নিমাকে জিজ্ঞাসা করে পেয়ালাটা চিনে নিলেন। একটুখানি জলও যোগাড় করলেন। আমি তাঁর হাত থেকে পেয়ালাটা কেড়ে নিয়ে ঘষে ঘষে ধুয়ে ফেললুম। বিস্ময়ের অন্ত নেই নিমার, ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে রইল আমার হাতের দিকে।

আজকের স্তুজাটা অপূর্ব লাগল স্বাদে। আগ্রহ করে আর এক বাটি চেয়ে নিলুম।

লামা আমার পরিতৃপ্তির কারণ জানেন। নিমা কেমন অবাক হয়ে গেছে। যে লোক এক বাটি স্তুজা খায় বিকৃত মুখে, আজ সেই লোক কিনা দু বাটি চেয়ে খাচ্ছে! অথচ আজই জিনিসটা খারাপ তৈরি হয়েছে।

নিমাকে তার নিঃশব্দ প্রশ্নের জবাব দিলেন লামা। হিন্দু কথাটা

শুনতে পেলুম। বোধ হয় বললেন, হিন্দুরা একটু খুঁতখুঁতে, শুচিবাই-গ্রস্ত।

নিমাকে বড় খুশী দেখাল। খানিকটা গম চড়িয়ে দিল কড়ায়ে, আর গুনগুন করে গান ধরল:

গিয়া ইয়োল্ ফুমো জে পালা ছার্—
কোন গ্যাগ্‌গো মান্‌ডো—
হু হু হু সুট্।

মুচকি হেসে লামা বললেন: ভারি ফুর্তি দেখছি নিমার।

আস্তে আস্তে কথাটা বললেন। নিমা শুনতে পেল না। পেলেও মানে বুঝত না।

আমি কিছু বলবার আগেই বললেন: মানে বুঝতে পাচ্ছ না তো? আর একবার গাইলেই তোমায় মানে বুঝিয়ে দেব।

আবার গাইল নিমা। ভারি মিষ্টি গলা, আর প্রাণবন্ত সুর।

লামা বললেন: বেশ মানেটি গানের।

তারপর আমার তরফ থেকে কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই বললেন: তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যা আমার দানাগুলো, ভাজব না বার বার—হু হু হু সুট্—

আমিও সুর করে বললুম: হু হু হু সুট্—

নিমা চমকে পিছনে চেয়ে যেন লজ্জায় মরে গেল। ঝপ করে কড়াইটা নামিয়ে রেখে ভাঁড়ারের বাসনপত্র হাতড়াতে লাগল উত্তেজিত ভাবে। হঠাৎ যেন কোন কিছুর প্রয়োজন হয়েছে বেয়াড়াভাবে।

দৃষ্টি দিয়ে তার হাত দুখানা অনুসরণ করে আমিও বাসনগুলো দেখতে লাগলুম। ভারি অদ্ভুত এদের বাসনপত্র। নানা আকারের ও নানা আকৃতির ঘড়া ঘটি ও জাগ। গাড়ুর আকৃতিই বেশি। কতকগুলো খেলার ট্রফি কাপের মতো তামার উপর কলাই করা। অ্যালুমিনিয়মও আছে। শুকনো মাংস ছাতু প্রভৃতি রাখবার জন্য কাঠের

বাসন। একটা হাপরও আছে। এই শীতের দেশে হাপর ছাড়া রান্নার কথা কেউ ভাবতেই পারে না।

লামা বললেন: চল, আমরা ফিরে যাই।

সাবধানে পা ফেলে ফেলে দুজনে বেরিয়ে এলুম।

আজ সকালে নিমা আমাদের কাছে এসে বসে নি। সেটা লক্ষ্য করে ভেবেছিলুম, বোধ হয় শবযাত্রা দেখবে না বলেই আড়ালে আছে। বাড়ির সামনের রাস্তায় 'বলো হরি, হরি বোল' শব্দ শুনলে বাড়ির পুরুষ ও মেয়েরা দুমুখো ছোটে। পুরুষরা বেরিয়ে আসে বাহিরে। মেয়েরা ছুটে যায় অন্দরে, যেখানে সেই হরিনাম পৌঁছয় না। যাদের পেয়েছে তাদের কাউকে হারাতে হবে, এ কথা ভাবতেও মেয়েদের বুকের ভিতরটা মুচড়ে ওঠে। এই জন্যই কি হরিনামে রুচি হারিয়েছে আমাদের আধুনিকারা?

লামা আর আমি পাশাপাশি শুয়েছি একই তাঁবুর ভিতর। নিমাও আছে আর একটা ধারে। না ডাকলে তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

লামা অনেকক্ষণ থেকেই বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করছিলেন। এইবারে কথা বললেন: আজ ঘুম আসছে না বুঝি?

সংক্ষেপে বললুম: না।

আর্দ্র কণ্ঠের প্রশ্ন এল: কেন বল তো?

কোথায় যেন তাল কেটে যাচ্ছে। সমস্ত অনুভূতিকে এক জায়গায় করেও তা ধরতে পাচ্ছি না। চুপ করে রইলুম।

লামা বললেন: আমি জানি।

চমকে উঠলুম: আপনি জানেন? আপনি কি মনের কথাও পড়তে পারেন?

লামা বললেন: আজকের এই মৃত্যুটা তোমাকে বিচলিত করেছে।

কই, না তো!

আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে দিলুম।

সত্যিই তাই : লামা বললেন শান্ত কণ্ঠে : লোকটা কেন মারা গেল, এই ভাবনা তোমাকে পীড়িত করছে। ওয়াঙ ডাক তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দিল, না শুধু আত্মার উস্কানি আছে কোনও ষড়যন্ত্রে—তোমার মন তার সদুত্তর পাচ্ছে না। তবে এটুকু বুঝতে পাচ্ছ যে এ দেশে মেয়েদের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লে তার একটা মারাত্মক পরিণতি আছে।

চমকে উঠলুম লামার কথা শুনে। আমিও যে একজন অপরিচিতা নারীর জীবনের সঙ্গে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ছি তাতে কি সন্দেহ নেই! তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ভয়ই কি আজ এই অস্থিরতা এনেছে! কিন্তু আমি তো এমন করে নিজের সম্বন্ধে ভাবি নি। কী আমার অন্যায়? এরাই তো আমাকে খুঁজে এনে আমার প্রাণ দান করেছে। আমি যে এদের কেনা গোলাম হয়ে রইলুম কৃতজ্ঞতায়।

গভীরভাবে বললুম : কিন্তু—

বাধা দিয়ে লামা বললেন : তোমার মন দিয়ে তো তোমার বিচার করবে না মানুষে।

তাঁর কণ্ঠস্বরে স্নেহের আস্বাদ পেলুম। চোখ দুটো বন্ধ করে বললেন : মানুষের বিচারে আর ভগবানের বিচারে প্রভেদ তো এইখানে। মানুষ বিচার করে যুক্তি দিয়ে, আর মন দিয়ে বিচার ভগবানের। মন যদি নিষ্পাপ থাকে, ভগবানের ক্ষমা তোমাকে রক্ষা করবেই।

কিন্তু—

তুমি সকালবেলার কথা ভাবছ?

প্রশ্নটা লামা কেড়ে নিলেন।

সকালের কোন্ ঘটনার উল্লেখ করছেন, তা ধরতে পারলুম না। বললুম : কোন্ কথা?

কেন, তুমি যখন নিমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠলে 'হু হু হু স্বুট', দেখতে পাও নি, বাইরে থেকে ওয়াঙ ডাক আর ছেরিং পেনছো

তোমাকে লক্ষ্য করছিল সন্দিগ্ধভাবে। নিমাও দেখতে পেয়েছে তাদের। বুদ্ধিমতী মেয়ে তোমাকে রক্ষা করার উপায়ও বোধ হয় স্থির করে ফেলেছে এতক্ষণে।

দুরন্ত ভয় ঠেলে উঠল গলা পর্যন্ত। অস্থিরভাবে বললুম: এ কি কোন অপরাধ হল?

লামা হেসে ফেললেন। বললেন: অপরাধ হল না? স্বামীদের অবর্তমানে তুমি স্ত্রীর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবে, তার আজন্ম সংস্কারের মূলে আঘাত করে তার আচারের পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করবে, তাদের প্রাপ্য স্নেহের পাকা ভাগীদার হয়ে বসবে এত অল্প সময়ে—এ তোমার অপরাধ নয়? এ দেখেও তারা অন্ধের মতো না-জানার ভান করে থাকবে?

তাই তো! ভয়ে আমি বুঝি কাঠ হয়ে গেছি।

আরও মিষ্টি করে হাসলেন লামা। বললেন: তুমি নিজের কথাটাই শুধু ভাবছ? আমার দিকেও তাকাও একবার। আমি তো মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি।

আমি আরও শঙ্কিত হলুম।

শিশুর মতো সরল হাসিতে ভরে উঠল লামার মুখ। বললেন: ওয়াঙ ডাক এখনও তো আমাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে। একজনকে সরিয়েছে বা সরে গেছে। আমাকে কোন রকমে সরাতে পারলেই তো তার প্রশস্ত পথ হবে নিষ্কণ্টক। এমন বিপদে পড়েন নি জাপানী শ্রমণ একাই কাওয়াগুচি। একটা কচি মেয়ে তাঁর প্রেমে পড়েছিল সত্যি, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা তাঁর ছিল না। এমন অবস্থায় পড়লে তিনি কী করতেন, তাই ভাবি।

আমি তাঁকে আশ্বাস দিলুম। বললুম: লামার গায়ে হাত তুলবে এমন পাষাণ্ড এ দেশে নেই।

লামা বললেন: এদের অসম্ভব কিছু নেই। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে পারে না, এমন কাজের নাম তিব্বতের অভিধানে নেই। সভ্যজগতের

কথাই ভেবে দেখ না একবার। স্বার্থের জন্যে কী কাড়াকাড়ি, কী হানাহানি। পৃথিবীর শান্তির জন্যে কী অশান্তির সৃষ্টি করছে সভ্য মানুষগুলো! দুর্বলকে রক্ষা করার নামে কী পীড়ন চলেছে দুর্বল-করে-রাখা জাতগুলোর ওপর! বুদ্ধ কি এ পাপ সহ্য করবেন? মানুষ নামের অমর্যাদা করছে স্বার্থলোভী যে অমানুষের দল, একদিন মাথা পেতে শাস্তি তাদের নিতেই হবে।

লামা উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন: আমি হয়তো সেদিন বেঁচে থাকব না। কিন্তু তুমি আমার ভবিষ্যদ্বাণী মিলিয়ে নিও।

তাঁবুর কোণায় নিমা উঠে বসে ছিল। বোধ হয় ভেবেছে, বৃদ্ধ হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন কার উপর! তিনি থামতেই নিমা আশ্বাসের ভঙ্গিতে কী যেন তাঁকে জানাল।

প্রফুল্ল হাসিতে আবার তাঁর মুখ উজ্জ্বল হল। জবাবটা আমাকেও বুঝিয়ে দিলেন, বললেন: নিমা বলছে, এদের সামলাবার মতো বুদ্ধি ও ক্ষমতা তার আছে। অনর্থক আমরা যেন বিচলিত না হই! কী বুদ্ধিমতী মেয়ে দেখ!

ছয়

বাহিরে হঠাৎ কোলাহল জেগে উঠল। সব কিছু ছাপিয়ে উঠছে কাড়ানাকাড়ার বাদ্য, তার সঙ্গে করতালের তাল। লামা বললেন: সৎকার সম্পন্ন করে লোকেরা ফিরল। এবারে এদের ভোজ হবে।

কারা এত খরচ করছে?

বর্ধিষ্ণু ঘরের ছেলে এরা। ছোট ভাইরা সঙ্গে আছে। চাকরও আছে অনেক।

বুড়ো বাপ-মা নিশ্চয়ই দেশে আছেন?

এদের আছেন কিনা জানি না, তবে অনেকের থাকেন।

থাকলে এই ভাইরা তাঁদের কী জবাব দেবে?

লামা হেসে বললেন: এত দীর্ঘ দিনের জন্যে এরা বেরোয় যে বাপ-মায়েরাও সবার' ফিরে আসার আশা রাখে না। যে সন্তানরা গেল, তাদের সবাই সুস্থ দেহে বহাল তবিয়তে ফিরে নাও আসতে পারে। ছেলেরাও যে ফিরে গিয়ে বাপ-মাকে জীবিত দেখবে, তেমন ভরসা রাখে না। এসব ঘটনা ও দুর্ঘটনাকে এমন গুরুত্ব দিচ্ছ দেখলে এরা নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবে।

মুখে কথা যোগাল না অনেকক্ষণ। এক সময় প্রশ্ন এল মনে। দ্বিধা না করে জিজ্ঞাসা করেই ফেললুম: কৈলাস কত দূর?

খাং রিম্‌পোছে? আমি নিজেই তার হদিস জানি না। শুধু এইটুকু জেনেছি যে এরা এখন গ্যাকার্কোর মণ্ডি যাচ্ছে। সেখান থেকে রেতাপুরী হয়ে এরা খাং রিম্‌পোছে যাবে।

আপনার তাড়া নেই কি একেবারে?

তাড়া থাকলেই বা করছি কী। একবার এদের আশ্রয় নিয়েছি এখন এই আশ্রয়েই যে আমাকে থাকতে হবে এ কথা নিঃসন্দেহে

জেনে নিশ্চিন্ত আছি। দেশের নিয়মে দলছাড়া মানেই এদের অপমান করা। তাড়ার জন্যে নিজের বিপদ ডাকার সাহস আমার নেই!

উদ্বিগ্ন হয়ে বললুম: তা হলে আমাকেও কি এদের দলেই এখন থাকতে হবে? দল ছাড়তে কোনদিনই পারব না?

লামা হেসে বললেন: দল ছেড়ে অন্য পথে যেতে চাও যাও। কিন্তু সেই একই পথে যাবে অথচ অন্য দলে ভিড়বে, তা হলে আর রক্ষে নেই। সে অপমানের প্রতিশোধ এরা নেবেই। খুন নিয়ে প্রতিশোধ।

সংকোচ ত্যাগ করে জিজ্ঞাসা করলুম: এ পথে ভারতীয়রা কি একেবারেই আসে না?

লামা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। মনে হল, আমার ভীরুতাকে উপহাস করছেন সংযতভাবে। বললেন: গ্যানিমার মণ্ডিতে অনেক হিন্দু দেখেছি, পাহাড়ী আর ভোটিয়া। গ্যাকার্কোর মণ্ডিতেও হয়তো অনেক হিন্দু আছে। কিন্তু এ তাদের কৈলাসের পথে যাত্রা নয়। তীর্থ করতে তারা আসে না, আসে নিছক ব্যবসার খাতিরে।

অনেক কথাই আজ জিজ্ঞাসা করে ফেলেছি, তাই বাকিটুকুও প্রশ্ন করে ফেললুম: আর যাঁরা তীর্থ করতে আসেন?

হাসতে হাসতেই জবাব দিলেন লামা, বললেন: পুরাং থেকে তাদের পথ সোজা উত্তরে গেছে, ছো মাফাম্ আর রাক্ষসতালের মাঝখান দিয়ে। তীর্থলোভী অসংখ্য হিন্দুর সে পথে আনাগোনা।

চোখ বন্ধ করে দেখলুম, মানস সরোবর আর রাবণ হ্রদের জল দোলা দিচ্ছে উদার দিগন্তে। তারই মাঝখান দিয়ে চলেছে আমার পরমাত্মীয়েরা। তাদের চলন দেখেই চিনতে পারছি, তারা আমার কত আপন কত অন্তরঙ্গ! এক সঙ্গে চলতে চলতে হঠাৎ পথ হারিয়ে আমি এই নিষ্ঠুর জগতে এসে পড়েছি। একথা ভাবতেই আমার বুকের ভিতর এক অদ্ভুত বেদনা উঠল টনটন করে। সে পথে কি ফিরতে পারব না কোনদিন? মনের প্রশ্ন আমার মুখে বেরিয়ে এল।

শুনে লামা বললেন: ঘরের টান তোমার ঘরে রেখে আসতে

পারলে না? পুরুষমানুষ তুমি, প্রাণের মায়া তোমার বুদ্ধিকে এমন আচ্ছন্ন করবে কেন?

একটু থেমে বললেন: এ তোমার একার দোষ নয় তা জানি। তোমার জাতের, তোমার ধর্মের এই দুর্বলতা। তা না হলে হিন্দুর ধর্ম রইল হিন্দুস্থানেই সীমাবদ্ধ হয়ে! মুসলমান হিন্দুর ধর্ম নষ্ট করল, বৌদ্ধরা বেরিয়ে এল সারা দুনিয়াকে বুদ্ধের বাণী শোনাতে, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে খ্রীষ্টানরাও তাদের মতবাদ সর্বত্র প্রচার করে যাচ্ছে। পিছিয়ে রইল শুধু হিন্দুরা। সে তোমাদের ভয়। তোমাদের বিবেকানন্দ একজন, অথচ আমরা সকলেই ছোট ছোট বিবেকানন্দ। জ্ঞানের গভীরতায় নয়, শুধু মনের জোরে। বুদ্ধ বেঁচে আছেন—এই বিশ্বাস আমাদের বুকের রক্তে। প্রলোভন আমরা জয় করেছি, নীচতাকে বর্জন করেছি ঘৃণায়। তাই মানুষকে ভয় পাই নে। আজকের মানুষ তো এই দুয়েরই প্রতিমূর্তি।

গভীর আবেগে লামা চোখ বুজলেন। গুন গুন করে গাইলেন:

সাঙ্গে লা ছিব্ গিউ নাঙ্গো
টাশী ডিলে ফুন্ সুম্ ছোগ্।

—হে বুদ্ধদেব, অপার তোমার মহিমা, তুমি আবার আমাদের ভিতর ফিরে এস।

জানি না কেন আমার সাহস এল বুকে। বললুম: দুর্বলতাকে আমিও জয় করব। আমিও আপনার সঙ্গে রইলুম।

সাবাস!

বলে শুয়ে শুয়েই লামা আমার কাঁধ ঠুকে দিলেন।

দু বাটি চা হাতে করে নিমা এসে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কখন যে সে উঠে গেছে টের পাই নি। তবে এটুকুর যে প্রয়োজন হয়েছিল তা বাটি হাতে নিয়েই বুঝতে পারলুম। তাঁবুর তলা দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে দেহটা কাঁপিয়া দিয়ে গেল। বিছানায় বসেই আমরা চায়ের বাটিতে চুমুক দিলুম।

লাম। আমার বাটির দিকে চেয়ে এক গাল হাসলেন। এত হাসতেও পারেন ভদ্রলোক! নিমা যে লজ্জা পেয়েছে তা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারা গেল। সেই পরিচ্ছন্ন বাটির পানীয়টুকু এক নিশ্বাসে শেষ করে তার হাতে ফিরিয়ে দিলুম। আজ আর প্রশ্নের অপেক্ষা রাখল না, চকিতে আর এক বাটি এনে সামনে এগিয়ে ধরল। এই সুজার একটা গুণ লক্ষ্য করেছি। পানের সঙ্গে সঙ্গেই শীতবোধ কমে যায়, নতুন বল পাই শরীরে। কিছু না খেয়েও মনে হয়, পেটে খাদ্য গেছে অনেকটা।

কিছুক্ষণ থেকেই শুনছিলুম, বাইরের জনতা উত্তরোত্তর উদ্দাম হয়ে উঠছে। লামার মনোযোগও সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। বললেন: মদের মাত্রা বোধ হয় বেশী হয়েছে।

তাই নাকি?

চল না, বেরিয়েই দেখা যাক।

তাঁবুর বাহিরে বেরিয়ে প্রথমেই যা চোখে পড়ল, অসম্ভব না হলেও তা অভাবনীয়। নিমা তার সেজ স্বামীর একেবারে গায়ের উপর ঘনিয়ে বসে চা খাচ্ছে ছাতু মিলিয়ে। কথায় আর হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে ঝরনার মতো।

লামা আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে বললেন: এর অর্থ তোমায় পরে বলব।

খানিকটা দূরে জনকয়েক লোক তখন ঢলাঢলি শুরু করেছে। সূর্য ডুবে গেছে, আলোর ঝলমলানি তবু নেবে নি। দক্ষিণ থেকে হিম হাওয়া আসছে সিরসির করে। এই হাওয়াই বরফের ছুঁচ বেঁধাবে আর একটু পরে। লামা বললেন: এস, হাওয়া বাঁচিয়ে এই ধারটায় একটু বসা যাক। অনেক কিছু দেখতে পাওয়া যাবে।

আমাদের ছোকরা লামাটিকেও দেখতে পেলুম। তারও পা দুটো টলছে। সুস্থ আত্তমাদের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটার সঙ্গেই গল্প করছে কোমরে হাত দিয়ে। নিমা আঙুল দিয়ে ছেরিং পেনছোকে

দেখাল এই দৃশ্য। বোধ হয় কিছু নির্দেশও দিল। তা না হলে লোকটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেত না। অল্পক্ষণেই ওয়াং ডাককে সঙ্গে নিয়ে সে ফিরে এল। নিমা আর এক বাটি চা আনল ওয়াং ডাকের জন্য। কিন্তু চায়ের বাটি হাতে নিয়ে লোকটা চা খাবার কথা যেন ভুলে গেল। তার দৃষ্টি গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে সুমু আঙমাদের উপর।

মুচকি হেসে লামা বললেন : দেখছ তো, কেমন নিপুণভাবে নিমা তার কাজ হাসিল করছে? এই বুড়োর ওপর থেকে ওয়াং ডাকের খুনে দৃষ্টি কেমন চালান করে দিচ্ছে অন্যের ওপর?

কেন জানি না হঠাৎ আমার মনে হল, শেক্সপীয়রের ইয়াগো আজ এই মুহূর্তে হেরে গেল নিমার কাছে। দুজনের চরিত্রের মিল নেই এতটুকু, কিন্তু একজন আর একজনকে মনে করিয়ে দিচ্ছে বুদ্ধির চমৎকারিত্বে।

সুমু আঙমাও দেখতে পেয়েছে ওয়াং ডাককে। কিন্তু তার সাহসকে বলিহারি! ছোকরা লামাকে কী একটা বলে তীক্ষ্নস্বরে হেসে উঠল। বাতাসে হিমের ধার বাড়ছে, এই হাসিতে সেই ধার আরও তীব্র হল।

ওয়াং ডাকরে অস্থিরতা আমরা লক্ষ্য করলুম। তখুনি কিছু একটা করবার জন্য তার হাত দুটো বোধ হয় নিশপিশ করে উঠল। বাটি থেকে খানিকটা চা কি ছলকে মাটিতে পড়ল?

ছেরিং পেনছো ওয়াং ডাককে কিছু বলল দেখলুম। হয়তো কোন সান্ত্বনা দিল, কিংবা তার চা জুড়িয়ে যাচ্ছে তাই মনে করিয়ে দিল। কিন্তু ওয়াং ডাক আর বসল না। এক চুমুকে তার চায়ের বাটি নিঃশেষ করে উঠে দাঁড়াল, আর তাঁবুর পিছন দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিমার মুখে চোখে আবার সেই উচ্ছলতা দেখলুম, সার্থকতার আনন্দে উজ্জ্বল তার সুন্দর মুখখানা।

লামা বললেন : রাতে আজ নিশ্চিন্তে ঘুমনো যাবে।

আমি তাঁর মুখের দিকে চাইলুম।

লামা বললেন ঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি আজ বিশ্রীভাবে হেরে গেছি। ছুঁচো মেরে ওয়াং ডাক তার হাত কালি করবে না।

আমার মনে পড়ল লামার দুপুরের কথাগুলো।—'অপরাধ হল না? স্বামীদের অবর্তমানে তাদের স্ত্রীর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবে, তার আজন্ম সংস্কারের মূলে আঘাত করে তার আচারের পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করবে, তাদের প্রাপ্য স্নেহের পাকা ভাগীদার হয়ে বসবে এত অল্প সময়ে—এ অপরাধ নয়? এ দেখেও তারা অন্ধের মতো না-জানার ভান করে থাকবে?'

আমার রক্ত যেন হঠাৎ জমে গেল। দিনের আলোর উপর তখন সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। অন্ধকার কি মানুষের সাহসটুকুও হঠাৎ কেড়ে নেয়? পরিচ্ছন্ন আলোয় যে উদার আশ্বাস বুকের ভিতর ধুকপুক করছিল, অন্ধকারের ছোঁয়ায় এক নিমেষে তা উবে গেল। ভুলে গেলুম লামার সাহসের বাণী। ধর্মে আমাদের ভরসা কই?

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর লামা বললেন ঃ ভয় পেলে নাকি?

ভয় কিসের?

কেন, প্রাণের।

সব কথাতেই লামা হাসেন। কিন্তু এবারে অন্ধকারে তাঁর হাসিটুকু দেখতে পেলুম না। কিন্তু রহস্যের সুর ধরা পড়ল তাঁর বলার ভঙ্গিতে।

বললুম ঃ প্রাণ না গেলে তো প্রাণের মায়া যাবে না। মিথ্যে সাহস দেখিয়ে কেন সত্যকে অস্বীকার করি!

লামা বললেন ঃ ভয় নেই বন্ধু, তোমাকে রক্ষার ব্যবস্থাও এতক্ষণে নিমা করে ফেলেছে।

আশ্চর্য হয়ে বললুম ঃ সে কী করে?

লামা বললেন ঃ তুমি নিজেই জানতে পারবে।

একজন চাকর একটা প্রদীপ দিয়ে গেল। তাঁবুর ভিতরে লামাকে

কী বলে গেল বুঝতে পারলুম না। লামা বললেন: খাবার আসছে। চল, ভেতরে যাই।

সত্যিই নিমা এল খাবার হাতে করে। তার পিছনে ছেরিং পেনছো। একসঙ্গে সবাই খেতে বসলুম। নিমা আজ বাটিতে ঢেলে তার স্বামীকে মদ দিলনা। তার বদলে একটা হাত খানেক লম্বা কাঠের চোঙা এনে দিল। শুনলুম তার ভিতরে আছে জোয়ারের মদ। গোড়ায় ছাকনি আছে। মদের নাম ছাং। খাগড়ার মতো নল দিয়ে সেই মদ খেতে হয়। নিমা তার সঙ্গে শুকনো মাংসও দিল।

লামা বললেন: তোমরাও তো মাংস খাও শুনেছি। চেখে দেখ না, কেমন লাগে এ দেশের মাংস।

বললুম: শুকনো মাংস আমরা খাই নে। আমরা কাঁচা মাংস রান্না করে খাই।

লামা বললেন: ভয় পেও না, মাংস এখানে পচে না। এখানকার ঠাণ্ডা এমন প্রবল যে কোন জিনিসেরই পচবার উপায় নেই। এরা তাই সেদ্ধও খায়, শুকনোও খায়।

বললুম: মাংস ওরাই খাক। আমার দই-ছাতুই ভাল।

লামা হেসে বললেন: নিমা বলেছে, গ্যাকার্কোর মণ্ডিতে পৌঁছে সে তোমাকে সবজি আর ভাত খাওয়াবে, আর গমের রুটি। হিন্দুরা একবার তাকে খাইয়েছিল। কী অদ্ভুত খাবার! বলতে গিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল এই মেয়েটা।

ছেরিং পেনছোর চোঙার ভিতর নিমা আরও খানিকটা মদ ঢেলে দিল। তার পর গল্প জুড়ল লামার সঙ্গে।

চমরীর মাখনে জ্বলছে প্রদীপ। বড় স্নিগ্ধ তার আলোটুকু। কেমন একটু নেশা লেগেছে আবহাওয়ায়।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে লামা বললেন: দেখ তো কী অদ্ভুত কথা নিমা বলছে! আমাকে ধরেছে মদ খেতে। আমি বৌদ্ধ, আমি কি এসব অনাচার করতে পারি! এরা তা মানবে না। বলে,

তাদের লামারা কি বৌদ্ধ নয়? তুমিই বল। তুমি তো লামাও নও, তুমি মদ খাও না কেন?

বললুম: ভাল লাগে না বলে।

লামা যেন চটে উঠলেন, বললেন: মিথ্যে কথা। তুমি খাও না নেশা হবার ভয়ে। আমি জানি, মাতাল করে এমন জিনিস ছুঁতে হিন্দুদের বড় ভয়।

ছেরিং পেনছো এবারে আমার দিকে চেয়ে কথা কইল। খুশী হয়ে লামা বললেন: হল তো, তোমাকেও বলছে মদ খেতে।

নিমা আরও একটু মদ এনে দিল তার স্বামীকে। সেদিকে তাকিয়ে আনন্দ উপছে উঠল পেনছোর দু চোখে। আবার কিছু বলল। লামা বললেন: চেখেই দেখ না খানিকটা। নিমার দিল নাকি আজ খুলে গেছে, বলছে তার স্বামী। যা পাও নিয়ে নাও।

আরও খানিকটা মদ আর মাংস ধ্বংস করে তারা বেরিয়ে গেল। যাবার আগে নিমা লামাকে কী সব বলে গেল। চোখ ছোট করে লামা মুচকি মুচকি হাসলেন। তার পর আমাকে বললেন: এস, এবারে শুয়ে পড়ি।

বলে হাত বাড়িয়ে প্রদীপটা দিলেন নিবিয়ে।

আমি শুয়ে পড়তেই আস্তে আস্তে বললেন: দেখলে তো নিমাকে? কেমন ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে তার স্বামীকে। আজ তারা পাশের তাঁবুতে একসঙ্গে শোবে। মদ খাইয়ে তার বুদ্ধি এনেছে ঝিমিয়ে, এবারে উত্তাপ দিয়ে মাতাল করবে ওই হ্যাংলাটাকে। আজকের এই পরিপূর্ণ নেশার ঘোর কাটিয়ে উঠতে ওই বোকাটার এক যুগ সময় লাগবে। তত দিনে তুমি এদের দল থেকে কেটে পড়তে পারবে নিরাপদে।

জীবনে এমন মিষ্টি কথা কখন শুনেছি বলে মনে পড়ল না।

লামা বললেন: তার চাকর দুজন আজ আমাদের তাঁবু পাহারা দেবে। সাবধানের মার নেই।

বুদ্ধ সত্যিই বেঁচে আছেন। মনে মনে তাঁকে আমি প্রণাম জানালুম।

সাত

খুটখাট দুপদাপ শব্দে শেষরাতেই ঘুম ভেঙে গেল। তাঁবুর ভিতর অন্ধকার তখনও গাঢ় হয়ে আছে। পাশে লামার উপস্থিতি অনুভব করলুম, গভীর নিদ্রায় তিনি মগ্ন। পা টিপে টিপে আমি তাঁবুর বাহিরে বেরিয়ে এলুম।

উঃ, কী কনকনে হাওয়া! শরীরেব সমস্ত অঙ্গ একসঙ্গে অবশ করে আনছে। এমন শীতেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে!

অস্বচ্ছ আলোয় সেই ছোকরা লামাকে দেখলুম, অত্যন্ত তৎপরভাবে লোক দিয়ে সুনু আওমাদের তাঁবু তোলাচ্ছে। নিজেও সাহায্য করছে তাদের। সুনু আওমার বাবা বোঝা বাঁধাচ্ছিলেন ইয়াকের পিঠে। রাত্রির শেষ প্রহরেই এরা যাত্রা শুরু করবে।

এদের ব্যস্ততা দেখে মনে হল, এরা বুঝি পালিয়ে যাচ্ছে। সুনু আওমাকে দেখলুম একখণ্ড পাথরের উপর চুপ করে বসে আছে। কিছু ভাবছে, না উপভোগ করছে পরিস্থিতিটা, তা বোঝা গেল না।

হঠাৎ একটা বেদনা বোধ করলুম ওয়াং ডাকের জন্য। গভীর ঘুমে সে বোধ হয় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। জেগে উঠে হয়তো সে হায় হায় করে উঠবে, কিংবা হিংসার ছুরি বুকের ভিতর লুকিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবে তাদের পিছনে।

তার সঙ্গে বৈরিতা আমাদের মিটে গেছে। সুস্থ মানুষ যেমন করে প্রতিবেশীর জন্য ভাবে, তেমনি সুস্থ মন নিয়ে নিজের কর্তব্য স্থির করতে চেষ্টা করলুম। পরিষ্কারভাবে কাউকেই চেনা যাচ্ছে না। লুকিয়ে যদি ওয়াং ডাককে জাগিয়ে দিয়ে আসি, তা হলে সেই তো তার কর্তব্য বেছে নিতে পারবে।

আমাদের তাঁবুগুলিতে তখনও প্রাণের স্পন্দন জাগে নি। শুধু

গোটাকয়েক খি জেগে আছে। এমন ভীষণদর্শন কুকুর আমাদের দেশে নেই। আমি পিছন দিয়ে লুকিয়ে ওয়াং ডাকের কাছে গেলুম।

ঘন অন্ধকারের ভিতরেও স্পষ্ট দেখতে পেলুম, সব কিছু বেঁধে ছেঁদে সে তৈরি হয়ে আছে। অস্থিরভাবে পায়চারি করছে তাঁবুর ভিতর। আমাকে চিনতে না পেরে লাফিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। রুক্ষস্বরে বোধ হয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করল।

পরিচয়! সত্যিই তো, কী আমার পরিচয়! এরা কেউই আমার নাম জানে না। ভাষা বোঝে না। অথচ এই মুহূর্তে পরিচয় না দিলে হয়তো জীবনটাই হারাতে হবে। নিজের অজ্ঞাতসারেই মুখে উত্তর এল ঃ হিন্দু।

হিন্দু! এই পরিচয়ই তো আমার সম্পূর্ণ পরিচয়। ভারতীয় বললে যে সবটুকু বলা হত না। মানব সভ্যতার প্রথম বিকাশের দিনে যে ভারত উজ্জ্বল ছিল আপন মহিমায়, সে হিন্দুর ভারত। সে যুগের হিন্দুর কাছে সারা বিশ্ব সভ্যতার দীক্ষা নিয়েছে। আজ আবার আমরা অতীতকে ফিরিয়ে আনবার দায়িত্ব নিয়েছি। আবার আমাদের হিন্দু নামেই পরিচয় হোক।

ওয়াং ডাক শান্ত হল। আমার অপেক্ষাই কি সে করছিল! ইশারায় তাকে বাহিরটা দেখতে বললুম।

অন্ধকারেও ওয়াং ডাকের হাসিটুকু দেখতে পেলুম। বড় করুণ নিষ্প্রাণ হাসি, মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল।

তারপর অনুভব করলুম, লু আর ইয়াক তাড়িয়ে সুমু আওমারা চলে যাচ্ছে। ওয়াং ডাক আবার অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে যা বলল, তার অর্থ বুঝতে পারলুম না।

ইয়াকের খুরের শব্দ মিলিয়ে যেতেই ওয়াং ডাক বেরিয়ে পড়ল। তার চাকরটিও যে তাঁবুর ভিতর জেগে বসে ছিল, তা দেখতে পাই নি। লোকটা অতি নিপুণ হাতে তাঁবুটা গুটিয়ে ইয়াকের পিঠে বেঁধে ফেলল। যাবার আগে আমাদের তাঁবুগুলোর দিকে ওয়াং ডাক

একবার তাকাল, কেউই জাগে নি। আমার হাত দুটো হঠাৎ জড়িয়ে ধরে কী বলে গেল বুঝতে না পারলেও বেদনায় বুকটা ভরে গেল।

আমি যখন আমাদের তাঁবুর ভিতরে ফিরে এলুম, লামা তখনও নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমচ্ছেন। ভোরের আলোর জন্য মুহূর্ত গণনা করছে পুবের আকাশ। ঘুমোবার আর সময় নেই।

বাইরে আবার নতুন শব্দ পেলুম। আবার কোনও দল তাঁবু তুলছে। চাকরেরা গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠল। মনে হল, তাদেরও হাত নিশপিশ করছে তাঁবু তোলবার জন্য।

আমি আমার পায়ের ব্যথা ভুলে গেছি, আমার পা দুটোও হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল পথ চলার আনন্দে। লামাকে জাগিয়ে সে কথাটা জানিয়ে দিলুম।

সাবাস!

বলে লামা আমার পিঠ ঠুকে দিলেন।

নিমা বোধহয় রাজী হচ্ছিল না প্রথমটায়, শেষে আমার উৎসাহ দেখে যাত্রার ব্যবস্থা করল।

এক সময় আমরাও তাঁবু তুলে যাত্রা করলুম। নিমা জোর করে আমাকে একটা ইয়াকের পিঠে তুলে দিল। লামা বললেন: ভালই করেছে এটা। কষ্ট করে পথ চলতে গিয়ে আবার শুয়ে পড়বে তো! এ তার চেয়ে ভাল।

সারি দিয়ে আমরা চলেছি—মানুষ আর ইয়াক, কেউ আগে কেউ পিছনে। তিব্বতে লাংকা চলার এই রীতি। লাংকা মানে পথ। ইয়াকের পিঠে মাল বোঝাই করে হেঁটে বা ডোকছার পিঠে চড়ে রুক্ষ পার্বত্য পথে চলেছে তিব্বতের মানুষ। অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। আরও কতকাল চলবে কে জানে! পথ চলার যে আরও উপায় থাকতে পারে, সে কথা এরা ভাবতে শেখেনি। শিখতে

চায় নি। ঘরের দুয়ার এঁটে সভ্যতার সূর্যকে এরা আজও ঠেকিয়ে রেখেছে।

ইতিহাসের যুগের আগেও এমনি ছিল। খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার থেকে আড়াই হাজার বছর আগে এই মধ্য-এশিয়াতেই গাঢ় সবুজ রঙের একরকম মূল্যবান পাথর পাওয়া যেত। এই পাথর পারস্য ও মিশরে আদর পেয়েছিল অলঙ্কাররূপে। তারিম নদীর অববাহিকায় অবস্থিত কাশগড় শহর ধীরে ধীরে এই বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠল। অসংখ্য ইয়াকের পিঠে বোঝাই হয়ে সেই পাথর ভারতে আসত বাল্‌খ্‌ ও বামিয়ানের পথে সিন্ধু নদের অববাহিকা বেয়ে মহেঞ্জোদড়ো ও পঞ্জাব শহরে। তার পর পার্সিপোলিস ও উরের পথে যেত মিশরের মেম্ফিস শহরে। তখনও মানুষ আর ইয়াক চলত এমনি করে আগে আর পিছনে।

মধ্য এশিয়া ভারতের সঙ্গে রেশমের ব্যবসা করেছে খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ শো থেকে পাঁচ শো খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। নানকিং থেকে কাশগড়, সেখান থেকে তশকুরগান, বাল্‌খ্‌ ও বামিয়ান হয়ে তক্ষশীলায় আসত সে রেশম। সেও এই ইয়াকের পিঠে।

আজ আর রেশম আসে না। আসে পশম। কাশ্মীর-আলমোড়া-সিকিম-দার্জিলিঙের পথে। সেও ইয়াকের পিঠে। যানবাহনের কত অভূতপূর্ব পরিবর্তন হল পৃথিবীর সারা দেশে। তিব্বত তার ইয়াককে নিয়ে আজও বেঁচে আছে। এরা ইয়াকের দুধ মাখন আর মাংস খায়, ঘুঁটের আগুন জ্বেলে রাঁধে, মাখনে প্রদীপ জ্বালে। ইয়াকের লোমের কাপড় পরে এরা, চামড়ার জুতো। ইয়াক আছে বলে তিব্বতীরা বেঁচে আছে, ইয়াক তিব্বতের প্রাণ।

রুক্ষ শুকনো পাথুরে মাটির উপর ইয়াকের পায়ের শব্দ উঠছে, গলার ঘণ্টা বাজছে একটানা। নিমা তার স্বামীর সঙ্গে এগিয়ে গেছে অনেকটা। পথ চলতে তাদের ক্লান্তি নেই। আরও যারা তাঁবু খাটিয়েছিল আমাদের সঙ্গে, তারাও জোড়ায় জোড়ায় চলেছে কেউ

আগে কেউ পিছনে। লামা একটা শক্ত লাঠি ঠুকে আমার পাশে পাশে চলেছেন নিঃশব্দ পদক্ষেপে। বুড়ো মানুষ। চলতে যে টান ধরে, মনে হল, কথা বলে তা বাড়াতে চান না।

আমি ভাবছিলুম তিব্বতের কথা। কেন এরা এমন পিছিয়ে আছে। দক্ষিণে দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় এ দেশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। উত্তরে এরা ছড়িয়ে গিয়েছিল তারিম নদীর অববাহিকা পর্যন্ত। কিন্তু সত্যিকার তিব্বত তো সে নয়, সে অনেক দক্ষিণে, সেদিনের বাণিজ্য-পথ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। আশেপাশের দেশে ছিল উদ্দাম দুরন্ত যাযাবরের দল। লুঠের লোভে হিমালয় ডিঙিয়ে ভারতবর্ষে এসেছে, কিন্তু তিব্বতে যায় নি। এই রুক্ষ পাথরের দেশের উত্তাপ আর বরফের ঝড়ের গল্প শুনেছে তাদের পিতামহের কাছে। সে দেশে গেলে মানুষ আর ফেরে না, এমনি একটা আতঙ্ক নিয়ে জন্মাত সেদিনের যাযাবর-শিশু। তিব্বতে তাই বাহিরের আলো এল না।

এই শীতাতপদগ্ধ দেশে উদ্ভিদ জন্মাল না বটে, কিন্তু প্রয়োজনের বেশি পশু ছড়িয়ে ছিল সারা মুলুকটায়। এরা তাই চাষা না হয়ে ব্যাধ হল। যা একটু কৃষিকার্য হত তা হিমালয়ের পাদদেশে সিন্ধু জাঙ্‌পোর উপত্যকায়। ভারতে আর্য অধিকারের পর সভ্যতার এই রশ্মিটুকু এসে পড়েছিল হিমালয়ের গুপ্ত রন্ধ্র দিয়ে।

ছোট ছোট দলে মিলিত হয়ে মঙ্গোলিয়া তখন মহা শক্তিশালী হূণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছে। তিব্বতীদের লুঠের লোভ জেগেছে চীন আর মঙ্গোলিয়ার বাণিজ্যপথের উপর। কিন্তু তারা দল গড়তে পারছে না নিজেদের দলাদলির জন্য। তার পর যেদিন হিমালয়ের গুহা বিদীর্ণ করে বন্দী বন্যাবারির মতো বৌদ্ধধর্ম এলো তিব্বতে, সব ভেদাভেদ সেদিন ভেসে গেল।

এ দেশের সভ্যতা যে একদিন ভারত থেকে গেছে, তাতে আজ সন্দেহ নেই। তিব্বতের প্রথম রাজা সংচেন গাংম্পোর ছিল দুই

রাণী। দুয়োরাণী ওয়াংচেনকে এনেছিলেন চীন থেকে। চীনরাজ তাইস্তুঙকে যুদ্ধে বিপর্যস্ত করে তাঁর কন্যাকে পেলেন সন্ধির শর্তরূপে। সুয়োরাণী ভৃকুটী দেবীকে আনলেন তাঁর পিতা নেপালরাজ অংশুবর্মার অন্তঃপুর থেকে। এঁরাই তিব্বতের রাজাকে বৌদ্ধ করলেন। এঁরাই ভারতে পাঠালেন মন্ত্রী সম্ভোটাকে, যিনি পরবর্তী কালে বঙ্গ ও মগধে প্রচলিত বর্ণমালার প্রবর্ত্তনা করেন নিজ দেশে উঁচে নামে। বঙ্গ ও মগধে তাদের বর্ণমালার পরিবর্ত্তন হয়েছে, তিব্বতে হয় নি।

তিব্বতের স্বর্ণযুগ এল অষ্টম শতাব্দীতে। নিজের বীর্যে তারা এগিয়েছে আর চীনা ও তুর্কীদের যুক্ত চাপে পিছিয়েছে। আরবের সঙ্গে সন্ধি করে হাত বাড়িয়েছে ফরগণার উপর, আর চীনের মণিমুক্তা লুঠে এনেছে তার রাজধানী বিধ্বস্ত করে।

গ্যাস-ভরা বেলুন যেমন হঠাৎ চুপসে নেমে পড়ে, নবম শতাব্দীতে এসে তিব্বতের ক্ষমতা তেমনি হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। এর জন্য বৌদ্ধ ধর্মকেই অনেকে দায়ী করেন। বৌদ্ধধর্ম তখন সারা দেশ ছেয়ে সমস্ত দেশবাসীর মনে নতুন বিপ্লবের সূচনা করেছে। ভারত ও চীনের বৌদ্ধদের মতো তিব্বতের লামারা ধর্মের সূক্ষ্ম শাস্ত্রবিচারে সন্তুষ্ট রইল না। তারা প্রত্যেকেই একএকজন জাদুকর হয়ে উঠল। ধর্মের এই নতুন ব্যাখ্যা দেশে চমক লাগাল, এবং দেখতে দেখতেই গোটা দেশটা ভরে গেল কুসংস্কারে।

চীনারা দাবি করে যে তিব্বতীরা সভ্য হল চীনে রাজকন্যার তিব্বত প্রবেশের পর। ভাত আর বার্লি থেকে মদ তৈরি শিখল, আর শিখল জলে কল চালানো। চীনা কারিকর এল তিব্বতে আর তিব্বতী ছাত্র গেল চীনে। নবম শতাব্দী থেকে তিব্বত সকল দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দিয়ে শান্তির জীবন যাপন করে আসছে। যা কিছু সম্বন্ধ রেখেছে তারা, তা ওই চীনের সঙ্গে।

চীন আজ জেগে উঠেছে। কিন্তু তিব্বত চলেছে তার রুক্ষ পার্বত্যপথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, লাঠি ঠুকে ঠুকে, কিংবা ইয়াকের পিঠে

চেপে। আমি আজ অশক্ত হয়ে ইয়াকের পিঠে চেপেছি, আর লামা চলেছেন লাঠি ঠুকে ঠুকে। সবাই চলেছে এমনি করে—তিব্বতের মানুষ আর ইয়াক, কেউ আগে আর কেউ পিছনে।

এক সময় কথা বললেন লামা: আজ কি মুখ বুঁজেই যাবে নাকি বন্ধু?

কথা বললে আপনার কষ্ট হবে যে!

কথা না বলেও যে হাঁপিয়ে উঠছি!

কিন্তু কথা বললে আরও বেশি হাঁপাবেন।

লামা বললেন: এস, ওই সামনের পাথরটায় খানিক বসি। আমরা তো তিব্বতী নই, আমরা পিছিয়ে পড়লে দোষ হবে না।

বসবার প্রয়োজন আমার না থাকলেও লামার ছিল। তিনি অনেকক্ষণ থেকেই হাঁপাচ্ছিলেন অল্প অল্প। বললুম: সেই ভাল।

পাথরের কাছে পৌঁছে তিনি আমার ইয়াকের দড়ি ধরলেন। আমি নেমে পড়লুম। তার পর পাথরের উপর দুজনে চেপে বসলুম।

একটু দম পেতেই লামা বললেন: সত্যি করে বল তো, কী ভাবছিলে।

বিশ্বাস করবেন কি?

কেন করব না? মানুষ মিথ্যা বলে, এ কথাটাই বরং আমরা বিশ্বাস করি না।

ভাবছিলুম তিব্বতের কথা। একটা ইংরেজী বইএ তিব্বতের ইতিহাস পড়েছিলুম অনেক দিন আগে, সেই কথা আজ মনে আসছিল। তখন কি ভেবেছিলুম এই তিব্বতের সঙ্গে একদিন এমন গভীর পরিচয় ঘটবে!

তুমি তিব্বতের রাজকাহিনী পড়েছ?

পড়ি নি বললুম।

লামা বললেন: ভারি মজার বই। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গল্প লিখেছে এরা ঠিক আমাদের মতো করে। কিন্তু এদের সব কথা

বিশ্বাস ক'রো না যেন। তা হলেই বিপদ। এরা বলে, খ্রীষ্টের জন্মের কিছু আগে লাসার দক্ষিণে একটি অপূর্ব শিশু পাওয়া যায়। সাক্ষাৎ বুদ্ধের অবতার। এই শিশু বড় হয়ে একটি রাজ্য স্থাপন করেন, এবং এঁরই বংশধরেরা উত্তরোত্তর দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টির উন্নতি করেন। দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই বংশের সপ্তম রাজার সময় চামড়া থেকে বস্ত্র তৈরি হল, আর দেশে আখরোটের চাষ হল।

এর আগে কি দেশে বস্ত্রের প্রচলন ছিল না?

লামা একটু বিব্রত বোধ করলেন, বললেন: তাই তো, সে কথা তো কখনও ভেবে দেখি নি!

দুজন তিব্বতী যাচ্ছিল সামনে দিয়ে। তিব্বতী ভাষায় কী একটা বলতেই লামা চমকে উঠলেন, বললেন: গেল গেল, তোমার ইয়াক গেল!

গল্পে গল্পে খেয়াল করি নি আমরা, ইয়াকটা যেমন চলছিল, তেমনি এগিয়ে গেছে। থেমে থাকার অভ্যাস বুঝি এদের নেই।

এবারে আমাদের পা চালিয়ে চলতে হল। এগিয়ে গিয়ে সে জন্তুটাকে ধরতে পারলে পা দুখানা আবার বিশ্রাম পাবে।

লামা বললেন: পিছিয়ে পড়াটা ভাবনার কথা নয় এ দেশে। যারা এগিয়ে যায়, তারা আমাদের দেশের মতো এগোতে পারে না যে, ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে একবার গাড়ি ফেল হলেই। খানিকটা এগিয়েই এরা থামবে, তাঁবু খাটিয়ে রাত্রিবাস করবে। আমরা যারা পেছনে পড়ি, তারা আবার গিয়ে তাদের ধরে ফেলব।

পরম নিশ্চিন্তে ইয়াকটা পথ চলছে। টিন টিন করে তার গলার ঘণ্টা বাজছে একটানা। আমরাও চলেছি।

আট

এমন পথ চলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। আমাদের আছে কলে ছাপানো টাইমটেবিল। সকাল সাড়ে আটটায় ছ নম্বর কালকা-কলকাতা মেলে দিল্লী ছাড়লে পরদির সকাল দশটায় কলকাতা পৌঁছব। টুণ্ডলায় লাঞ্চ খাব, এলাহাবাদে ডাইনিং কারে উঠব ডিনার খেতে, ভোরবেলা আসানসোলে খাব ব্রেকফাস্ট। কলকাতায় কোথায় উঠব, কদিন থাকব, কখানা জামাকাপড় লাগবে, কত টাকার প্রয়োজন হবে, তার হিসেব আছে। কাজ-কর্মের ফিরিস্তির সঙ্গে ফেরার দিনও ঠিক হয়ে গেছে। বেরহবার আগেই আমাদের ব্যবস্থা তৈরি। গেল বছর রমেশবাবুরা সস্ত্রীক কেদার-বদরি গিয়েছিলেন। তাঁরাও একটা প্রোগ্রাম করেছিলেন। রমেশবাবুর স্ত্রীর পুরনো কোমরের ব্যথার জন্য দুটো দিন মাত্র বেশী সময় লেগেছিল। আমরা এমনি চলার সঙ্গে পরিচিত।

লামা বললেন : দূরে কিছু দেখতে পাচ্ছ কি ?

বলে আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন।

সত্যি কিছু দেখতে পেলুম। সামনে রাস্তার বাঁ ধারে মাইল খানেক দূরে একটা বড় পাথরের পাশ দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে বেরিয়ে আসছে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম।

লামা আমার হাত ধরে বললেন : দাঁড়ালে কেন ?

আমাদের সামনে যারা চলেছে, তারাও দাঁড়ায় নি। আমরাও চলতে লাগলুম।

আরও একটু কাছে এলে দৃশ্যটা স্পষ্টতর হল। এগুলোকে ঘোড়া বলব, না গাধা ? কালচে বাদামি রঙ গায়ের, পেটটা সাদা আর ঘাড়ের চুল কালো। পাক খেয়ে খেয়ে রাস্তার দিকে

এগিয়ে আসছে। একবার পাক খায়, আর দাঁড়িয়ে পিছন মুখে দেখে।

আমরা অসমতল বঙ্কিম পথে চলেছি। কখন এক সময় সেই জানোয়ারগুলো রাস্তার ডান দিকে এসে গেছে দেখতে পাই নি। লামা বললেন : এদের কী নাম জান ?

তাব পব নিজেই উত্তর দিলেন : ইংরেজী নাম জানি না। তিব্বতীবা বলে ক্যায়াঙ। এগুলো বুনো ঘোড়া। পোষা ঘোড়াকে এরা তা বলে।

একবার একখানা ইংরেজী ছবিতে বুনো ঘোড়া দেখেছিলুম। কী দুর্দম প্রাণবন্ত ঘোড়া ! স্থানীয় লোকেরা কাঠের খুঁটি আর শক্ত বাঁশ দিয়ে একটা গোল জায়গা ঘেরে। তার একটা দরজা। তার পর পাঁচ-ছটা জোয়ান লোক মজবুত ঘোড়ায় চড়ে এমনই একটা বুনো ঘোড়াকে দলছাড়া করে এনে ভিতরে ঢোকায়। বারে বারে ধরে আনে, আর বারে বারেই এরা সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে পালিয়ে যায়। লোকগুলো তবু হার মানতে চায় না।

ক্যায়াঙগুলো তেমন তেজী নয়। ভীরুই মনে হয়। কিন্তু এখানকার লোকেবা তাদের ধরে বশ করবাব চেষ্টা করে কি না, লামা তা বলতে পারলেন না।

সহসা একটা হাসির ঝরনা পথের উপর ভেঙে পড়ল। প্রাণেব আবেগে উচ্ছল উদ্দাম। চমকে উঠে আমরা দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়লুম। তার পরেই সেই হাসিতে নিজেদের খুশি যোগ করে দিলুম। নিমা আর ছেরিং পেনছো একখানা পাথরের উপর বসে আমাদের অপেক্ষা করছিল। দেখতে না পেয়ে আমরা তাদের পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। আমাদের অন্যমনস্কতা দেখেই তারা হেসে উঠেছে। এমন সরল প্রাণখোলা হাসি বুঝি আগে কখন দেখি নি।

ছেরিং পেনছো কী একটা রসিকতা করে প্রচণ্ড উল্লাসে আবার হেসে উঠল। নিমাও হাসল তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে। লামা তরল

আনন্দে তার তর্জমা শোনালেন আমাকে। বললেন : নিমা নাকি বলছে যে তুমি পুরুষ না হয়ে মেয়ে হলে আমি তোমায় বিয়েই করে ফেলতুম এতদিনে। আমাদেব ভাব নাকি এমনই জমাট!

আমি হেসে বললুম : সুন্নু আঙমা তা হলে আত্মহত্যা করত।

লামাও উপভোগ করলেন রহস্যটুকু। তাদের অনুবাদ করে বলতেই তারা আবার হাসিতে ফেটে পড়ল।

পথ চলতে চলতে নিমা এবারে লামার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও আমি সে গল্পের কোন সূত্র খুঁজে পেলুম না। লামা আমার কৌতূহল লক্ষ্য কবে বললেন : আমার কাছে খানিকক্ষণ করে রোজ ব'স, আমি তোমায় এদের ভাষা ভাল করে শিখিয়ে দেব।

আপনি শিখলেন কার কাছে?

হাসতে হাসতে লামা বললেন : বই পড়ে নিশ্চয়ই নয়। সারাটা পথ এদেব সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। এ দেশে আমার কম দিন তো হল না।

কোনও আয়াস না করে এ দেশের ভাষা শিখে যাব, ভাবতে মন্দ লাগে না। বললুম : বেশ তো।

খুশী হয়ে লামা নিমাদের এ সংবাদ দিলেন। তাবা আর এক দফা হাসল।

লামা বললেন : একটু আগে তুমি যা বুঝতে পার নি, সেটা হচ্ছে সুন্নু আঙমাব কথা। নিমা তারই গল্প বলছিল। সে যখন রান্নার তাঁবুতে আমাদেব খাবার ব্যবস্থা দেখত, সুন্নু আঙমা আসত তাব কাছে। নানান গল্প কবত। বলত, নিমাও তো সুন্দরী মেয়ে, ইচ্ছা করলে সেও কোন লামাকে বিয়ে করতে পারত। কেন যে নিমা একজন লামা পছন্দ না করে একদল মানুষ বিয়ে কবল, এ কথা সে বুঝতে পারে না। তারপর জিজ্ঞেস করত আমার কথা। আমি কি সত্যিই চীনের লামা, না চীনের লামা সেজে তাকে দূরে ঠেলবার চেষ্টা করছি। আর চীনের লামা হলেই বা কী, চীন আর তিব্বত

তো দূর নয়। পাশাপাশি ছুটো দেশ চিরকালই মিলেমিশে আছে। সুন্থু আওমার ভারি আশ্চর্য লাগে আমার বোকামি দেখে। তার বাবা এত বড়লোক, দেড় শো ইয়াক আর সাড়ে তিন শো জু তাদের। বলতে গেলে ডাম গ্যা শোর রাজাই তার বাবা। কিন্তু এতটুকু লোভ নেই লামার? সে তো একমাত্র মেয়ে, সব সে-ই পেত। চাই কি একটা মঠই তুলে দিত তার লামার জন্যে। সুন্থু আওমা ছুঃখ করে আর বলে, কী বোকাই হয় চীন দেশের লামাগুলো! তিব্বতী হলে নিশ্চয়ই এমন নিরেট হত না। এ সব গল্প শুনতে নিমার ভারি ভাল লাগত। সহানুভূতি দেখাত সুন্থু আওমাকে। শেষ পর্যন্ত তাকে বলেই বসত, আমি তো তাদের সঙ্গেই থাকি। সারাদিন গল্পগুজব করি। নিমা যেন আমাকে একটু বুঝিয়ে দেয় আমার লাভের কথাটা। ভাল করে বোঝালে গাধাও বোঝে, আর একটা লামা বুঝবে না। পড়াশুনো করে মানুষ তো গাধার চেয়েও বোকা হয় না।

লামা হাসতে লাগলেন অদ্ভুতভাবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: নিমা কী জবাব দিত?

এ কথাটা তাঁর জেনে নেওয়া হয় নি। নিমাকে প্রশ্ন করে উত্তর দিলেন, বললেন: নিমা রোজই তাকে আশ্বাস দিত—এখনও অনেক পথ আছে, তার আগেই একটা ব্যবস্থা করে দেবে।

বলে লামা হাসতে লাগলেন। তার পর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন: কী বিপদেই পড়েছিলুম বল। আমি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। আমার এ সব ছুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত! আর এই বয়সে!

এ দেশে লামারা বুঝি এমন করে?

বিরক্তভাবে লামা বললেন: এদের কথা ছেড়ে দাও। দেশ-সুদ্ধই তো লামা, এরা। সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে লামা হচ্ছে, আবার লামারা প্রলোভনে পড়ে সংসারী হচ্ছে। সত্যিকার লামা আর কজন?

আমি চুপ করে আছি। লামা আর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন,

হঠাৎ নিমার আর্তনাদ শুনে থেমে গেলেন। আর্তনাদ নয়, সতর্ক-বাণী। আকাশে ঝড়ের সংকেত দেখে আমাদের জাগিয়ে দিয়েছে। ঝড় আসবার আগেই একটা আশ্রয় খুঁজে বার করতে হবে।

দু পাশে জলার মতন ভিজে জায়গা। তারই স্থানে স্থানে গমের চারায় শিষ বেরিয়েছে। খানিকটা এগিয়ে একটা উঁচু পাহাড়, আর তার পরেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর। শেষ বেলার আলো হঠাৎ ঝিমিয়ে এল। আকাশে ঘন কালো মেঘ ভারি হয়ে ঝুলে পড়েছে। দেখতে দেখতে হলদে আলোয় উজ্জ্বল হল সারা আকাশ। সরু রেখার মতো নীল বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে গেল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। তার পর আবার সেই ফিকে চোখ ধাঁধানো আলো। কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল বোঝাব আগেই বজ্রেব অট্টহাসি উঠল সারা আকাশ তোলপাড় কবে। ছেলেবেলায় বাজে-পোড়া তালগাছ দেখেছিলুম, শুকনো মাঠের উপব ন্যাড়া দাঁড়িয়ে আছে। আজ এই বাজের শব্দ আর বিদ্যুতের লকলকে আলো দেখে মনে হল, আমাদের পিছনে যারা আসছে তারা আজ বাজে-পোড়া মানুষ দেখবে এই রাস্তার উপব। এক সময় শিলাবৃষ্টি শুরু হল। কী ঘন তীক্ষ্ণ শিলা! মেঘের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে সারা আকাশ। বিদ্যুৎ চমকে উঠে আরও আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে পৃথিবীটা।

ইয়াকের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে তারই পেটের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলুম। লামাও গুটি গুটি এগিয়ে এসে আমার পাশে গা ঘেঁষে বসলেন। নিমারা তাদের কানের উপর আলখাল্লা উঠিয়ে রাস্তার ধারেই দাঁড়িয়ে রইল।

আস্তে আস্তে লামা বললেন: হঠাৎ কী বিপদ বল দেখি! ধারে কাছে একটা শিঙও নেই!

শিঙ কী?

শিঙ জানো না? শিঙ, ট্রি।

ট্রি মানে গাছ জানি। বললুম: প্রাণটা রক্ষে পেলে বাঁচি।

আশ্বাস দিয়ে লামা বললেন : প্রাণ যাবে না তা জানি। দেখ না, কেমন নির্ভয়ে ওরা দাঁড়িয়ে আছে।

নিমাদের দেখতে গিয়ে আরও একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। সামনের সেই উঁচু পাহাড়ে মনে হল কে একটা লোক পাগলের মতো ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। বিদ্যুতের আলোয় তার নতুন নতুন রূপ দেখতে পেলুম। কখনও তার জপের মালা ঘুরিয়ে ভর্ৎসনা করছে এই দুর্যোগকে, কখনও উন্মত্তের মতো নেচে লাফিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে আকাশখানা। কখনও আবার রাগে দুঃখে নিজের পরনের কাপড় ছিঁড়ে কুটিকুটি করে উড়িয়ে দিচ্ছে বাতাসে। তার পর ঢিল ছোঁড়ার মতো কী· যেন ছুঁড়তে লাগল আকাশের মেঘ আর বিদ্যুৎ লক্ষ্য করে। মনে হল, সমস্ত শক্তি দিয়ে লোকটা এই ঝঞ্ঝার সঙ্গে একা লড়ছে ওই পর্বতচূড়ায়।

ঘণ্টাখানেক ধরে এই যুদ্ধ চলল। তারপর ভেলকি বাজির মতো সহসা দৃশ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল। প্রসন্ন নীল আকাশে অস্তগামী সূর্যের আলো ঝলমল করে উঠল, স্নিগ্ধ বাতাস এল ফুলের সৌরভের মতো। ইয়াকের পেটের তলা থেকে বেরিয়ে এসে ভাবলুম, দুঃস্বপ্ন দেখেছি এতক্ষণ। এক ঘণ্টা আগের আর পরের আবহাওয়ায় পার্থক্য দেখছি না তো এতটুকু। শুধু ফেনশুভ্র শিলা খণ্ডে প্রান্তর গেছে ছেয়ে, আর শীতল বারিবিন্দুর সংস্পর্শে এসে দেহটা কেঁপে উঠছে বার বার।

পাহাড়ের উপরকার সেই লোকটিকে আবার দেখতে পেলুম। আনন্দের প্রতিমূর্তির মত দু হাত-পা তুলে যেন নৃত্য করছে। লামার দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলুম। তিনিও স্তম্ভিত হয়ে এ দৃশ্য দেখেছেন এতক্ষণ। ছেরিং পেনছোকে বোধ হয় এই কথাই জিজ্ঞাসা করলেন। সে লোকটা প্রবল উৎসাহে একটানা কথা বলতে লাগল। দেখলুম তার পায়ের চেয়ে মুখ চলছে তাড়াতাড়ি।

আমাকে ধৈর্য ধরতেই হবে। সমস্ত গল্পটা শুনে লামা আমাকে

তার তর্জমা করে শোনাবেন। শোনালেনও। বললেন ঃ ওঁরা এক জাতের লামা, তিব্বতীরা ওঁদের ঙাক্‌পা বলে। লাসায় ওঁদের গল্প শুনেছিলুম, দেখলুম এই প্রথম। সারা বছরে ওঁদের কাজ শুধু এই সময়টিতে। ভীষণ শিলাবৃষ্টি থেকে ওঁরা শস্য রক্ষা করেন। তার জন্যে চাষারা ওঁদের শস্যের ভাগ দেয়। এক ট্যান জমির জন্যে চাষাদের দুই থেকে আড়াই শো গম কর দিতে হয়। এ দেশের অশিক্ষিত চাষাদের বিশ্বাস, শয়তানেরা শীতকালের বরফ থেকে শিলা তৈরি করে রাখে, আর গ্রীষ্মকালে যখন গমের শিষে ফসল আসে তখন এই শিলা বর্ষণ করে তাদের সর্বনাশ করে। ঙাক্‌পারাও এই শয়তানদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে নদীর ধারে গিয়ে মাটির শিলা তৈরি করে রাখেন। যদি এই শয়তানদের হাত থেকে শস্য রক্ষা করতে না পারেন, তা হলে ওঁদেরই ক্ষতিপূরণ করতে হবে। সারা বছরের সঞ্চয় দিয়ে চাষাদের ওঁরা বাঁচাবেন। দেশের লোক তাই ওঁদের ভক্তি যত করে, ভয়ও পায় তত। দৈবক্ষমতায় ওঁরা যেমন শস্য রক্ষা করেন, তেমনি ওঁরা রুষ্ট হলে রক্ষা থাকে না সাধারণ লোকের। যতই দরিদ্র হোন ঙাক্‌পা, সম্মান তিনি সকলের কাছেই পাবেন। পথ চলতে পায়ে পায়ে প্রণাম কুড়িয়ে ওঁরা চলেন।

আমরা সেই জলা জায়গাটা তখন পেরিয়ে এসেছি। আরও খানিকটা এগিয়ে খান কয়েক তাঁবু দেখতে পাওয়া গেল। লামা বললেন ঃ ও কাদের তাঁবু বুঝতে পারছ ?

লামা নিজেই উত্তর দিলেন ঃ ওরা আমাদেরই দলের লোক। ঝড়ের জন্যে বোধ হয় আর এগোতে পারে নি।

ছেরিং পেনছো নিমাকে কিছু বলল। নিমাও তার উত্তর দিল। আমি লামার মুখের দিকে তাকালুম।

লামা হেসে বললেন ঃ ওয়াং ডাকের জন্য দুঃখ হচ্ছে। লোকটা সত্যিই মেয়েটাকে ভালবাসে। নিমা বলছে, ভালবাসার যোগ্য মেয়ে

কি আর এ দেশে নেই ? বড় একটা ধাক্কা না খেলে ও-মেয়েটার চোখ ফুটবে না।

এক পা পিছিয়ে পড়লুম আমরা। নিমারা স্বামী-স্ত্রীতে এক পা এগিয়ে চলল। তারাও গল্প করছে।

লামা বললেন : ছেরিং পেনছো একটা ভাল কথা বলেছে।

কোন্‌টা বলুন তো।

নিমাকে বলছে সুন্নু আওমাকে ডেকে একটা সোজা প্রশ্ন করতে —ওয়াং ডাককে সে বিয়ে করবে কি না ? সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর।

এর সোজা উত্তর তো সুন্নু আওমা দিয়েছে।

দিয়েছে নাকি ?

কেন, আপনিই তো বলেছেন, লামা ছাড়া সাধারণ মানুষকে সে বিয়ে করবে না।

লামা হাসলেন, বললেন : সে একটা কথা হল ! বিয়ে হলে সে লামা কি আর লামা থাকবে ! সেও তো সাধারণ মানুষ হল।

তবু তো তার সান্ত্বনা থাকবে, সে একজন লামাকে বিয়ে করেছে, স্বর্গের সিঁড়ির আধখানা যে উঠেছিল।

এবারে লামা বেশ মিষ্টি করে হাসলেন, বললেন : প্রলোভন যে মানুষ জয় করতে পারে নি, সে কি ওই স্বর্গের সিঁড়িতে হাত ঠেকাতেই পেরেছে ?

এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাঁবুগুলো। মনে হল একটা পাথরের উপর বসে সুন্নু আওমা তার লামার সঙ্গে গল্প করছে।

নয়

সকালবেলা দল ছাড়ার সময় ওয়াং ডাক বোধহয় ভাবতেই পারে নি যে আমাদের সঙ্গে এ যাত্রায় তার আবার দেখা হবে। ভেবেছিল সুমু আওমার আর তো পেছুটান রইল না, সে এগিয়েই যাবে। আর তার জন্যে ওয়াং ডাককেও এগিয়ে চলতে হবে। আমাদের তাঁবু ফেলবার খুটখাট শব্দে লোকটা তাঁবুর বাইরে এল। প্রথমটায় মনে হল, সে বোধহয় তার নিজের চোখ তুটোকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সেই হকচকিয়ে যাওয়া ভাবটা কেটে যেতেই ছুটে এসে ছেরিং পেছোকে জড়িয়ে ধরল। হৃদ্যতা তাদের আগে কখনও লক্ষ্য করি নি।

লামা বললেন ঃ নতুন ভাব! কাল তুপুরে তাদের মনের মিল হয়েছে।

কাল তো সারাদিন এদের দেখতে পাই নি।

ওয়াং ডাকের তাঁবুতে সারাদিন গুজগুজ করেছে এই তুই মক্কেল। যতদিন আমি একা ছিলুম, ওয়াং ডাকের তুঃখ কেউ বোঝেনি। তুমি এসে এদের মিল করালে।

সে কি!

লামা বললেন ঃ নিমার বড় স্বামী খাঁটি বস্তুবাদী লোক। ব্যবসা করতে বেরিয়ে নিছক প্রেম প্রীতি সহানুভূতির জন্যে তো বছরের মূল্যবান সময়টা নষ্ট করতে পারে না। তাই 'সবাই জাহান্নমে যাও' বলে গ্যাকার্কোর মণ্ডিতে গিয়ে টাকা লুটছে। এটি তার সেজ ভাই। বড় ভাই যখন ভর্ৎসনা শুরু করে, এ তখন বউএর আঁচলের তলায় ঢুকে আশ্রয় খোঁজে। সেই বউ কিনা তাকে তার প্রাপ্য না দিয়ে একটা বিদেশীকে প্রশ্রয় দিচ্ছে তারই চোখের সামনে! এইখানে তাদের মনের মিল।

এবারে একটু গম্ভীর হয়ে লামা বললেন : কাল রাতেই আমাদের শেষ হয়ে যাবার কথা ছিল। ওই ছোকরা লামা হঠাৎ এসে না পড়লে আজ আর আমাদের এমন করে গল্প করার সুযোগ হত না।

বলেন কি !

সত্যিই বলছি। যেমন কর্মক্ষম তেমনি বুদ্ধিমতী এ দেশের মেয়ে। এরা সামান্য অন্যমনস্ক হলে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা এক মুহূর্তে ঘটতে পারে। এদের তাই সাবধান না হয়ে উপায় নেই। শুনলে তুমি আশ্চর্য হবে, শুধু নিজের চাকর নয়, সুমু আঙমা আর ওয়াং ডাকের লোকদেরও সে হাত করে রেখেছে। কোন চক্রান্ত তার কাছে গোপন থাকবে না।

আমার আশ্চর্য হবার পালা শেষ হয় নি। লামা এতে কৌতুক বোধ করে বললেন : কাল এরা দুজনে স্থির করেছিল, রাতে আমাদেব তাঁবু আক্রমণ কবে একসঙ্গে আমাদের দুজনকে শেষ করবে। পায়ে কাঁটা নিয়ে পথ চলায় এদের বিশ্বাস নেই।

শিউরে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম : তারপর ?

লামা উত্তর দিলেন হেসে। বললেন : নিমা বিকেল বেলাতেই খবর পেয়ে গেল। নিজে ডেকে আনল তার স্বামীকে। ছোকরা লামাকে সে আগে থেকেই লক্ষ্য করছিল। তার স্বামীকে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিল যে সুমু আঙমা যদি বিয়ে করে তো সে ওই ছোকরা লামাকেই করবে। বুড়ো বয়সে আমাকে টানাটানি করলে আমি যে আত্মহত্যা করব স্থির করেছি, এ কথাও জানিয়ে দিল। এর পরের ঘটনা তুমি জান। বিষধর সাপের মতো ওয়াং ডাক তার তাঁবুর ভেতর সারারাত গর্জেছে কিন্তু অতগুলো খি ডিঙিয়ে সুমু আঙমার তাঁবুর ভেতর ঢোকবার সাহস তার হয় নি। আর এধারে নিমার উষ্ণ বাহুর ভেতর নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে রইল তার মাতাল স্বামী।

বন্ধুর সঙ্গে তার প্রাণের আবেগ বিনিময় করে ওয়াং ডাক এল

লামার কাছে। জিভ বার করে নিচু হয়ে সম্মান জানাল তার দেশীয় ভঙ্গিতে। আমারও দু হাত ধরে নিঃশব্দে তার সম্ভাষণ জানাল।

কেন জানি না, লোকটাকে আজ আমার ভাল লাগল। তার হিংসার কথা ভুলে গেলুম। ভুলে গেলুম তার পাশবিক ষড়যন্ত্রের কথা। মনে মনে তার যে রূপ দিয়েছিলুম এতদিন, সেই খুনে ডাকাতের রূপ যেন এই মুহূর্তে হঠাৎ বদলে গেল। মনে হল, সেই আদিম রিপু তাকে অমানুষ করেছে। লোকটা ভালবাসতে জানে, কিন্তু সেই ভালবাসা আজ প্রেমের সীমানা ছাড়িয়ে তাকে অন্ধ করেছে মোহে। অধিকারের লালসা তার স্থির বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছে এমন উদগ্রভাবে যে আজ পাপকে পাপ বলে তার মনে হচ্ছে না। তা না হলে ধর্মগুরুর গায়ে হাত তোলার উন্মাদনা পেল কোথা থেকে! এমন শিক্ষা তো এরা কখনও পায় না! লামা-হত্যার নজির আছে বলে তো আজও শুনি নি! সুখের দিনে যাকে চিনি নি, আজ দুঃখের ভিতর সে লোকটা যেন ধরা দিয়ে ফেলল। জগতের এই বুঝি নিয়ম।

সবাই বোধ হয় আমারই মতো ভাবছিল। লামা বললেন: নিমা কী বলছে জান?

নিজেই উত্তর দিলেন: বলছে, ওয়াং ডাক আমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে গেল।

ওয়াং ডাকের চোখ দুটো ছলছল করছিল। বোধ হয় ভাবছে, ও-তাঁবুর ওই মেয়েটা কেন এই পরিবারের হল না।

এরই নাম দৈব। এমনই ছোট ছোট ভুল চাল দিয়ে ভগবান এই পৃথিবীর সমস্ত জীবকে হয়রাণ করে মারছেন। এতেই তাঁর আনন্দ। পৃথিবীটাকে আর একটু সূর্যের মুখে চেপে দিলেই তো একদিনে সব ঝঞ্ঝাট শেষ হয়ে যায়।

আমাদের তাঁবু তখন খাটানো হয়েছে। পাশেরটাতে হাপরের হুসহাস শব্দ পাচ্ছি। ওয়াং ডাক এসে লামার পাশেই বসে পড়ল।

আমি এখানে স্বাধীনভাবে যা করতে পারি, তা চুপ করে থাকা।

চুপ করে শুধু এদের দেখা, আর লামা যখন কিছু বলেন তখন তা শোনা। এর বেশি আমার কাছে কেউ আশা করে না। আমারও এর বেশি কিছু আশা করার দাবি নেই।

লামা বললেন : ধৈর্য ধর বন্ধু, বলার মতো কথা হলেই তোমাকে আমি বলব।

আমাকে আশ্বাস দিয়ে লামা ওয়াং ডাকের গল্প শুনতে বসলেন। সে দীর্ঘ কাহিনী। আমি শুধু লামার মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগলুম। কখন রাগ কখন দুঃখ কখন ভয় কখন ঘৃণা ফুটে উঠছে সে মুখে। আরও অনেক ভাব দেখলুম যার নাম নেই বড় বড়। মাঝে মাঝে আমি সুনু আঙমাদেরও দেখছিলুম। ছোকরা লামা তাদের তাঁবুর পিছনে অস্থিবভাবে পায়চারি করছিল। হঠাৎ থেমে পড়ে কী ভাবল খানিকক্ষণ, তাবপর আবাব পায়চারি করতে লাগল জোবে জোরে।

তখনও পশ্চিমেব আকাশ থেকে অন্ধকাব নামে নি। শুধু ওই ধূসর পাহাড়টার ছায়া পড়ে মনে হচ্ছিল, বুঝি দিনের আলো আজকের মতো নিবে গেছে। ওয়াং ডাক উঠে দাঁড়িয়েছিল, নিমাদের কী একটা বলে বিদায় নিল।

ভাবলুম, লামা এবারে ওয়াং ডাকের গল্প শোনাবেন। কিন্তু শোনালেন না। নিমাদের কী সব জিজ্ঞাসা কবতে লাগলেন। জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করে তিনি আমার দিকে ফিবলেন। আমি ওয়াং ডাকের পরিত্যক্ত জায়গাটিতে গিয়ে বসলুম। লামা কথা বলেন খুব আস্তে আস্তে, একান্ত কাছে না বসলে সব কথা শোনা যায় না।

লামা বললেন : লোকটা অশিক্ষিত। বলল, অক্ষর পরিচয় তার হয় নি। কিন্তু কথা বলছিল যে কোন শিক্ষিত দেশের মানুষের মতো। বোধ হয় জান, এ দেশের গ্রামাঞ্চলে স্কুল কলেজ নেই। লেখাপড়া একটা মস্ত শৌখিনতা। কারও ছেলের যদি এ ঘোড়ারোগ হয়, তবে তাকে মঠে যেতে হবে লামাদের কাছে। আর লামা হয়ে লেখাপড়া

করতে হবে। তার পর ফিরে এসে গৃহী হওয়া যায়, কিন্তু দীর্ঘদিন মঠে থাকবার পর গৃহে ফেরবার বাসনা এদের আর থাকে না। স্বভাবতঃই এরা অলস। ফিরে গেলেই পেটের ভাবনা ভাবতে হবে, এই দুশ্চিন্তা এদের আর ফিরে যাবার উৎসাহ দেয় না। গ্রামাঞ্চলে তাই শিক্ষিত লোক দেখবে না। যাদের দেখবে তারা ওয়াং ডাকের মতোই অশিক্ষিত, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন আদিম যুগের মানুষ। এ দেশের শাসনকর্তারা আইন করে বিদেশীকে আটকে রেখে বর্বরতাকেই ধরে রেখেছে দেশের ভেতর। সভ্যতার সূর্য আজ সারা বিশ্বে আলোকপাত করেছে, সে আলোক এসে এ দেশের রুদ্ধ দরজায় ঠেকে রইল, ভেতরে প্রবেশের রন্ধ্র খুঁজে পেল না।

ওয়াং ডাকের কথা লামাকে স্মরণ করিয়ে দিলুম।

লামা তাঁর গল্পে ফিরে এলেন। বললেন: লোকটাকে আজ আমার সভ্যদেশের মানুষ বলে ভুল হচ্ছিল। শিক্ষা আর সভ্যতা তো এক নয়। আমাদের দেশেও আছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ, যারা আজও কোন শিক্ষা পায় নি। কিন্তু আমরা তাদের অসভ্য বলি না। তাদের রীতিনীতি আচার ব্যবহার সভ্যদেশের মতোই। জ্ঞানে নিঃস্ব হলেও মনুষ্যত্বে মহান তারা, বিলাসে অজ্ঞ হলেও উদারতায় উজ্জ্বল তারা। সাদা কাগজে কালো আঁচড় কেটে যে নীতি মানুষে তৈরি করেছে, সে রাজনীতি তারা শেখে নি। তারা জানে মানুষকে ভালবাসার রীতি। জন্মের সময় তাজা রক্তে বুকের পাতায় যে রীতি লিখে দিয়েছেন অদৃশ্য বিধাতা, প্রাণ দিয়ে এরা তার মর্যাদা রক্ষা করে।

লামার আজ অন্য রূপ দেখছি। ঠোঁটের কোণ থেকে সেই প্রসন্ন হাসির রেখাটুকু মিলিয়ে গেছে। বড় অস্থির দেখাচ্ছে তাঁকে। ভিতরে যে ঝড় বইছে, তাকে ঠেকিয়ে রাখতে যেন পারছেন না। এবারে আর বাধা দিলুম না। চুপ করে তাঁকে বলবার অবকাশ দিলুম।

খানিকক্ষণ থেমে লামা বললেন: ওয়াং ডাক বলছিল, সুস্থ আত্মা

ছেলেবেলাতেই তার মাকে হারিয়েছে। বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়ে বলে বেশ আদরে আবদারেই মানুষ হয়েছে এতকাল। মাথাটা বিগড়েছেও খানিকটা। মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধে তার বাপেরই তো বেশি দায়িত্ব, কিন্তু তিনি ভাবছেন নিজের স্বার্থ আর পদমর্যাদার কথা। গ্রামের বাপ-মা-হারা বাউণ্ডুলে ছেলে ওয়াং ডাক। রোজগার যা কিছু, সে তার একার। তার যদি চার-পাঁচটা রোজগেরে ভাই থাকত, তাহলে তাঁর মেয়ে দিতে বোধ হয় আপত্তি হত না। মেয়েকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তিনি তার মত করে দিতে পারতেন। এ কথা জেনে ঘৃণায় নাক সিঁটকেছে ওয়াং ডাক। আজ আমাকে বলল, কী নোংরা মনোভাব দেখুন। চার-পাঁচটা রোজগেরে স্বামীর বউ হয়ে সুন্নু আঙমা সুখে থাকবে সত্যি, কিন্তু সে কি একটা জীবন হল? আমি বললুম, সেই তো এ দেশের জীবন। নিমার উদাহরণ দিলুম আমি। কিন্তু ওয়াং ডাক তাতে ভুলল না। বলল, মরবার পর দেহটা টুকরো টুকরো করে কেটে একপাল শকুন দিয়ে খাওয়ানো যায়, কিন্তু জ্যান্ত হৃদয়টাকে ভাগ করে পাঁচটা মানুষকে কখনও দেওয়া চলে! নিমার কথা আলাদা। চারটে ভাই তারা। একটা মেয়েকে চার ভাগ করে ভোগ করার প্রবৃত্তি তাদের থাকে, তারা তাই করুক। কেউ তাদের বাধা দেবে না। তাই বলে নিজে একটা লোক বলে একটা গোটা মেয়ে কেউ পাবে না?

লামা বললেন: আমি তার ধারণাকে ভুল বললুম। বোঝালুম যে মেয়েটার মত এ নয়। সে সাধারণ মানুষের বদলে বিয়ে করতে চায় একজন লামাকে। আর তার স্নেহপ্রবণ বাপ মেয়ের স্বাধীন ইচ্ছার অন্তরায় হতে চান না। ওয়াং ডাক এ কথা মানল না। বলল, আমি ভুল করছি। সুন্নু আঙমার মাথাটা হয়তো বিগড়ে থাকতে পারে, কিন্তু তার বাপ এ ব্যাপারে সজ্ঞান। তিনি নিজের স্বার্থটাই দেখছেন। সুন্নু আঙমা যদি কোন লামাকে সত্যিই পাকড়াতে পারে, তা হলে সমাজে তাঁর মান উন্নীত হবে। আর সেই ভ্রষ্ট লামা কি মঠের কিছু ধনরত্ন আত্মসাৎ করে আনতে পারবে না। মেয়েমানুষে আসক্তি রয়েছে যে

লামার, তার পদস্খলন তো আমাদের মতো রোজকার ব্যাপার নয়। দুনিয়ায় এমন কুকাজ নেই, যা সে করতে পারবে না।

লামা আবার থামলেন, থেমে বললেন : এমন যুক্তির কথা শুনেছ কখন? নিজের জীবন দিয়েই তো এরা জীবনের পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছে—দুঃখের আগুনে গলানো খাঁটি সোনার মতো প্রেম দিয়ে! মিথ্যে আমরা সত্যের সন্ধানে মঠে মঠে পুঁথি হাতড়ে বেড়াই। আর কী পাই আমরা? ভিক্ষার ঝুলি হাতে কাঙালের মতো সারা বিশ্ব ঘুরে নিজের ক্ষুদ্রতাকেই কি শুধু বড় করে দেখতে শিখি না? নিজের জীবনটা ভরে না উঠলে পূর্ণতার সন্ধান পাব কি দুর্ভিক্ষের লঙ্গরখানায়?

আমি চমকে উঠলুম। এ কি কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুর বিশ্বাসের কথা শুনছি?

হঠাৎ লামা তাঁর সম্বিৎ ফিরে পেলেন। কান্নার মতো রুদ্ধকণ্ঠে বললেন : না না, এ আমি আমার কথা বলছি না। আমি বলছি এদের বিশ্বাসের কথা।

হঠাৎ খাপছাড়াভাবে বললেন : কী নিন্দুক এই ওয়াং ডাক লোকটা! নিজের দেশের লামাদের সম্বন্ধে কী বলে গেল জান? বলল, এরা সকলেই কি ধর্মের টানে লামা হয়! কাজ না করে ভাল খেয়ে পরে থাকবে, সমাজে প্রতিপত্তি হবে, এই আশাতেই না লোকে মঠে যায়! খানিকটা স্বার্থত্যাগ করতে হয় বইকি! কিন্তু সেটা কি সকলে পারে? মদে ও মেয়েমানুষে আসক্তি যায় নি, এমন লামা ঢের আছে এ দেশে। এরাই তো দেশের সর্বনাশ করছে। দেশের সরল মেয়েপুরুষের বিশ্বাস ভাঙিয়ে খাচ্ছে এই প্রতারকের দল। এ কথা বলবার সময় লোকটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বলল, এদের সংখ্যা একটা কমাতে পারলেও নাকি তার পাপ খানিকটা লাঘব হবে।

লামাও খানিকটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। বললেন : আর কী বলল জান? বলল, মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে সে জন্মের

মতো। এতদিন যা শুনে বিশ্বাস করতে তার বেদনা বোধ হত, এবারে তা নিজের চোখে দেখে জীবনে তার ঘেন্না ধরেছে। শুনেছিল, এ দেশের মেয়েরা ভাবে লামার সঙ্গ লাভ করলে তার দেহ পবিত্র হবে, সন্তান জন্মালে শাক্যমুনির বংশধর আসবে কোলে। অনেক পুরুষও আছে, যাদের নিজেদেরও এই মত। অথবা কোন মতই নেই। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই চরিত্রহীনতাকে তারা প্রশ্রয় দিচ্ছে।

লামা বললেন: আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, এ সব তার নিজের মত কিনা। লোকটা উত্তর দিল, এ তার একার মত নয়। দেশের অনেক যুবক আজ এই কথাই ভাবছে। ভাবছে, এই অনাচারের শেষ না হলে দেশ উচ্ছন্নে যাবে। সুন্নু আঙমাকে সে কেন বিয়ে করতে চায়, সে কথাও সে বলল। বলল, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে একটা গভীর অন্তরঙ্গ পবিত্র জীবন হতে পারে, দেশের লোককে তাই দেখাবার ইচ্ছে। লুংপা বলতে সমস্ত দেশটা সে বোঝায় না, শুধু তার আশে পাশের প্রতিবেশীরা তাদের দেখে তার মতটাকে মেনে নিলেই সে সুখী হবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লামা বললেন: যাবার সময় সে কী অনুরোধ করে গেছে জান? বলে গেছে এ দেশে তার একটা দিনও আর থাকার ইচ্ছে নেই। আমি যদি আমার সঙ্গে আমার দেশে তাকে নিয়ে না যাই তো আমার সামনেই সে আত্মহত্যা করবে। আড়চোখে কাঁধের বন্দুকটাও আমাকে দেখিয়ে গেছে।

পাহাড়ের গা বেয়ে অন্ধকার তখন গড়িয়ে এসেছে। ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে সেই অন্ধকার। নিমারা নিজেদের ভাষায় কথা বলছে অক্লান্ত-ভাবে। মনে হল, এই অন্ধকারের ভিতর আমরা ওয়াং ডাকের কথাই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। সে যে আমাদের অনেকদিনের চেনা মানুষ।

দশ

প্রদীপের আলোয় দেখলুম সুন্নু আঙমাকে। মাখনের প্রদীপ থেকে মিষ্টি আলো ছড়াচ্ছে। মাখনের মতোই মিষ্টি দেখলুম তার মুখখানি। নিমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছিল, আমরাও তার গল্প শুনছি।

একদিন লামার কাছে শুনেছিলুম, এ দেশের যারা সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাদের অন্নের সংস্থান করতে হয়, তাদের দেহে লালিত্য নেই। শ্রীহীন কঠিন তাদের মুখাবয়ব। এ দেশের হেলেন ধনীর ঘরে বাঁধা পড়েছে। লক্ষ্মী-সরস্বতীরও এতটুকু বিবাদ নেই। সরস্বতী স্বেচ্ছায় ধরা দেন লক্ষ্মীর সংসারে। সুন্নু আঙমার বাবা কি সত্যিই ডাম গ্যাশোর রাজা! সুন্নু আঙমাকে দেখে আজ এই প্রশ্নই প্রথম মনে এল।

আরও ভাল করে দেখলুম সুন্নু আঙমাকে। আমাদের দেশের কুমারী মেয়েদের মতো মাথায় ঘোমটা নেই, নেই কোন ওড়না বা টুপি। শুকনো রুক্ষ এক মাথা কোঁকড়ানো চুল অযত্নে অবহেলায় একেবারে জট পাকিয়ে আছে। তারই ভিতর হয়তো উকুন খেলে বেড়াচ্ছে পরম নিশ্চিন্তে।

বাতির ছায়া পড়েছিল সুন্নু আঙমার মুখে। গলায় ও ঘাড়ে পুরু হয়ে আছে নোংরামির প্রলেপ। রঙে আর ময়লায় বীভৎস দেখাচ্ছে তার সুন্দর মুখখানা। দূর থেকেই এদের দেখতে ভাল লাগে—যেমন ভাল লাগে আমাদের দেশী মেমসাহেবদের। কাছে এলে গা ঘিনঘিন করে উঠে নোংরামি দেখে, কিংবা প্রসাধনের ঘটায়। দুজনেই তারা সহজ শ্রীটুকু হারিয়েছে। একজন ঢেকেছে নোংরামি দিয়ে, আর একজন নোংরা হয়েছে রঙ মেখে।

লামা বোধহয় আমার এ ভাবটি লক্ষ্য করেছিলেন। সুম্মু আওমাকে কী একটা জিজ্ঞাসা করে তার উত্তর শোনালেন আমাকে। বললেন: সুম্মু আওমা আমাদের পাগল ভাবছে। বলছে, মাথা খারাপ না হলে লোকে এমন অদ্ভুত কথাও জিজ্ঞেস করে? বিশ বছর ধরে যে সৌভাগ্যকে সে আঁকড়ে ধরে আছে, আমাদের মতো পাগলের কথায় সে কি হঠাৎ তা ধুয়ে ফেলবে?

হাসতে হাসতে লামা বললেন: বুঝলে হিন্দু, ওই নোংরামির নিচে তার সৌভাগ্য বাঁধা পড়েছে, মুখে জল ঠেকালেই তা পালিয়ে যাবে! জীবনে একবারও দেহে জল ঠেকায় নি এমনে লোকও আছে এ দেশে। এ তাদের গর্বের বিষয়। আর পাঁচজনে তাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

এমন নোংরামির ভিতর মেয়েটা তার সারা জীবন কাটিয়ে দেবে?

বিয়ের আগে পর্যন্ত কোন পরিবর্তন হবে না। পাত্রপক্ষ যখন মেয়ে দেখতে আসবে, তখন মুখশ্রীর চেয়ে সুলক্ষণাদির বিচার করবে বেশি। একবারও মুখহাত ধোয় নি জানলে অর্ধেক নম্বর তখুনি পেয়ে যাবে। বাকি অর্ধেক পাবে আর কী কী নোংরা অভ্যেস আছে তার পরিচয় পেলে।

হাসতে হাসতে বললেন: পোশাকটা তার মাখনে মাংসে ধুলোয় আর শিকনিতে চামড়ার মতো চটচটে হয়ে থাকবে। সকলের সামনে হয়তো ছ্যাঁৎ করে নিজের নাকটা ঝেড়ে নেবে জামার আস্তিনে।

আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে আরও উৎসাহ পেলেন লামা। বললেন: সুম্মু আওমার হাত দুখানা কেমন ফরসা ধবধব করছে দেখ।

সত্যিই তাই।

কেন করবে না বল। ওই হাতেই তো ময়দা মাখছে, খাবার তৈরি করছে রোজ। ওই খাবার কেমন মিষ্টি লাগবে বলতো?

বাধা দিয়ে আমি বললুম: থাক্ থাক্, যথেষ্ট হয়েছে। এবারে অন্য গল্প বলুন।

আমি ভাবছিলুম আমার নিজের কথা। এখনও অনেকদিন এদের

সঙ্গে থাকতে হবে। এ সব গল্প শোনবার পর খাবার আর মুখে রুচবে না।

লামা থামলেন না। বললেন : নিমাকে দেখ, ঠিক একই রকম লাগছে কি দুজনকে ?

আমিও দুজনের প্রভেদটা লক্ষ্য করলুম। নিগ্রোর মতো কালো নয় নিমার মুখখানা, উজ্জ্বল তামাটে রঙ। খানিকটা জল আর খানিকটা রঙের ছাপ। মাথার চুলগুলি রুক্ষ হলেও পরিপাটি করে বাঁধা। তার উপর নানা অলঙ্কার। সাদা আর লাল রঙেব প্রবাল, শামুক আর কড়ির মালা। গলায় টাকার মালায় একখানা সোনার মোহরও দেখলুম প্রদীপের মিষ্টি আলোয় ঝিকমিক করছে। পথ চলবার সময় নিমাকে দেখেছি মাথায় টুপি পরতে। লামা বলেছিলেন, এটা ওদের বিবাহিত জীবনের চিহ্ন। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এ দেশের অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষকে খালি মাথায় চলতে হয়।

লামা নিমাকে জিজ্ঞাসা করে আরও খানিকটা সংবাদ আহরণ করলেন আমার জন্য। বললেন : বিয়ের পিঁড়িতে বসবার আগে নিমা প্রথম তার চুল আঁচড়েছিল, আর খোঁপায় পরেছিল গিয়েন-ছা, শামুক আর কড়ির মালা। নানা রঙের পাথর যে দেখছ, এগুলো ওর স্বামীদের দেওয়া। কখনও কোন স্বামীর সঙ্গে বিবাদ হলে তার দেওয়া পাথরটি মাথা থেকে নামিয়ে ফেললেই হল। তাতেই এদের বিবাহ বিচ্ছেদ। কোন প্রশ্ন না করে সমাজ এই ব্যবস্থাকে মেনে নেবে।

বললুম : ভারি মুশকিল তো এদের স্বামীদের। এক তরফা বিচার।

লামা বললেন : হবে না-ই বা কেন ? পুরুষেরা তো অলস মদ্যপ ও স্ত্রী-আসক্ত। পিঠে গাদা বন্দুক বেঁধে ঘোড়ায় চেপে এরা পাখি থেকে মানুষ পর্যন্ত শিকার করতে পারে, কিন্তু বিদেশীর কাঁধে বন্দুক দেখলে লক্ষ্মী ছেলের মতো নিজের তাঁবুতে এসে ঢোকে। এ দেশের মেয়েরাই তো সব। সংখ্যায় কম হতে পারে, শক্তিতে কম নয়

ক্ষেতে চাষের কাজ করতে দেখেছি এদের, দেখেছি সুতো কেটে কাপড় কার্পেট বুনতে। আবার আমাদের দেশের মেয়েদের মতো রান্না-বান্না করে গণ্ডেপিণ্ডে গেলাতে দেখেছি তাদের অপদার্থ স্বামীগুলোকে। পুরুষেরা কেবল বাণিজ্য করে, দেশের জিনিস বিদেশীদের হাতে তুলে দিয়ে বিদেশের জিনিস দেশে নিয়ে আসে। অভাব বোধের এদের একেবারেই অভাব। খানিকটা অভাব বোধ থাকলে এরা তাড়াতাড়ি মানুষ হত।

বললুম : অল্পে সন্তুষ্ট থাকাও তো একটা পরম গুণের কথা।

লামা বললেন : তা ঠিক। অভাববোধ বর্জন করে মানুষ অতি-মানুষ হয়। কিন্তু সংসারে বাস করতে হলে ওই অভাব বোধটাই মানুষকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ এনে দেয়। হঠাৎ যদি বিধাতার খেয়ালে দুনিয়ার অভাব বোধটা মিটে যায়, মানুষ কি আর কাজ করবে ভাব? অভাব বোধ আছে বলে আজ আমি এই দুস্তর দেশের মঠে মঠে পুথি হাঁতড়ে বেড়াচ্ছি। অভাব বোধ আছে বলে তুমি এসেছ ছো মাফাম্ আর খাং রিমপোছের সৌন্দর্য অন্বেষণে। অভাব বোধ আছে বলেই এরা বাণিজ্য করতে বেরিয়েছে। এ কথা মানতেই হবে। যার যত অভাব বোধ, পরিশ্রমের পরিমাণ তার তত বেশি। অভাব মিটে গেলেই জীবনের প্রয়োজন গেল ফুরিয়ে।

সুমু আওমা অনর্গল কথা বলে চলেছে নিমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেও মাঝে মাঝে লামা সেদিকে কান পেতে দিচ্ছেন। নিমার স্বামীর এ সব ভাল লাগছে না। তার নেশার সময় হয়েছে। মাখনের প্রদীপ জ্বেলে মদের জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করতে তার ভাল লাগে না।

এক সময় লামা বললেন : একটা নতুন খবর পাওয়া গেল। সুমু আওমা বলছে, সেই ছোকরা লামা তাকে বিয়ে করবে বলে সম্মত হয়েছে। হবে নাই বা কেন? মঠের ভেতর ছাতু দই খেয়ে পোকাধরা শুকনো পুথির ভেতর কী সে পাবে? তার চেয়ে ঢের লোভনীয় এই দেড় শো

ইয়াক আর সাড়ে তিন শো লু, সবার ওপর এই সুন্দর মেয়েটি। যত-দিন বাঁচবে, আকণ্ঠ ডুবে থাকবে চাছাং পেম্মায়।

লামার চোখজোড়া বুঝি ঘৃণায় জ্বলে উঠল!

এক সময় মুখে এক রকমের চুকচুক আওয়াজ করে সুন্নু আঙমা উঠে দাঁড়াল। ফিক করে হেসে তার কুচকুচে কালো দাঁতের হাসি দেখিয়ে বিদায় নিল। আমাদের দেশে অনেক সেকেলে মহিলার এমনই মিসি-ঘষা কালো দাঁত দেখেছি। তাতে নোংরামি নেই। সাদার বদলে অমন কালো দেখতেও মন্দ লাগে না। কিন্তু এ দাঁতের তুলনা নেই। নিজের নিতান্ত কাছে এ দাঁত দেখলে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত উঠে আসবে।

লামা বললেন: নিমার কাছে এতক্ষণ তার লামার গুণ ব্যাখান করছিল। সাক্ষাৎ বুদ্ধের অবতার। অনেক পুণ্য করে এমন লামার সাক্ষাৎ সে পেয়েছে। আরও অনেক কথা বলবার তার শখ ছিল, কিন্তু বুড়ো বাপ ব্যস্ত হবে বলে ফিরে যাচ্ছে।

সত্যিই তার বাপ ব্যস্ত হয়েছিলেন। পরক্ষণেই এলেন মেয়ের খোঁজে। নিমা তাকেও আপ্যায়িত করে বসাল।

এবারে তার স্বামীর বিরক্তি ধরা পড়ল ব্যবহারে। একটি সুন্দরী মেয়েকে বসিয়ে কথা বলছে বলুক, সে বরং সহ্য করা যায়। কিন্তু এ বুড়োটাকে কেন! ওয়াং ডাকের সঙ্গে কাজ আছে বলে সে বেরিয়ে গেল। লামা হেসে এ কথা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন।

সুন্নু আঙমার বাবা তাঁর দুঃখের কাহিনী শোনালেন লামাকে। আমিও সে গল্পের অনুবাদ শুনলুম। মা-মরা মেয়ে আদরে আহ্লাদে মানুষ হয়েছে এতদিন। তার ভাইদেরও সন্তান নেই। ভগবানের ইচ্ছেয় সম্পত্তির অভাব তাঁদের নেই। আর সুন্নু আঙমাকে বিয়ে করবার জন্য ভাল ছেলেরও অভাব দেশে ছিল না। এই তো সেদিন যে ছোকরা মারা গেল, বেশ সমৃদ্ধ তারা। অনেকগুলো ভাই, সুখেই থাকতে পেত। কিন্তু লামা বিয়ে করবে বলে মেয়ে জেদ ধরেছে। আর এই লামা খুঁজতেই এত দুঃখের পথে আসা।

ছোকরা লামার গল্পও আমরা শুনলুম। বড় সৎ লোক, নিরহঙ্কার, পরদুঃখকাতর। এ না হলে লামা! সুমু আঙমাকে দুঃখ দিতে না পেরে নিতান্ত দায়ে পড়েই তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন। তা না হলে বুদ্ধের সেবা ফেলে মানুষের সুখের জন্য এমন কাজ তিনি করতেন না। তবে কিনা মানুষের সেবাই বুদ্ধের সেবা, মানুষকে উপেক্ষা করে তো বুদ্ধকে পাওয়া যায় না—এই তাঁর মত। এমন লামার সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁরা ধন্য হয়েছেন।

উত্তেজিতভাবে ছেরিং পেনছো ফিরে এল। যা বলল তার মানে শুনলুম, ওয়াং ডাক তার তাঁবুতে নেই, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

লামা উত্তেজিত হলেন না। তাকে যা বললেন, আমাকেও সেই কথাই বললেন: তাতে ভাবনার কী আছে! কোথাও হয়তো বেড়াতে গেছে, এখুনি ফিরে আসবে।

ছেরিং পেনছো তাতে সন্তুষ্ট হল না। নিমাও কী একটা প্রশ্ন করল। লামা বললেন: মেয়েদের মন কেমন সন্দিগ্ধ দেখ। জিজ্ঞেস করছে, সেই ছোকরা লামা আছে তো সুমু আঙমাদের তাঁবুতে?

ছেরিং পেনছোর এ খবরটুকু জানা ছিল না। বোধ হয় নেবার প্রয়োজন মনে করে নি। এবারে ছুটে গেল সেই খবর আনতে। আর পরক্ষণেই ফিরে এসে বলল: কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল, এইমাত্র ফিরেছে।

নিমা তাকে বসিয়ে দিয়ে নিজে গেল খবর আনতে। লামা বললেন: আর ভাবনা নেই। নিমা যখন গেছে, তখন খবর একটা আনবেই।

সুমু আঙমার বাবা ওয়াং ডাকের গল্প বললেন। লামার মুখে সেটুকুও শুনলুম। লোকটা নাকি একটা গুণ্ডা, গোঁয়ার-গোবিন্দ গোছের। চাল-চুলো নেই, খেতে পায় না দুবেলা। মদ জোটে তো মাংস নেই, মাখন জোটে তো চা নেই। নজর কিন্তু উঁচু। বামন হয়ে

চাঁদে হাত। বলে, সুন্নু আঙমাকে বিয়ে করবে। এমন লোকের সঙ্গে বিয়ে দিলে গ্রামের লোক যে ছি ছি করবে তাকে।

লামা জিজ্ঞাসা করলেন : করে কী লোকটা ?

উত্তরটাও আমাকে শোনালেন। কী আর করে! তিন কুলে তো কেউ নেই ওর। নিজেই একটু চাষবাস করে। জানোয়ার আছে গোটাকয়েক, আর ঘোড়ায় চেপে সুন্নু আঙমার পেছনে ঘোরে। তার জ্বালায় মেয়েটার এতটুকু শান্তি নেই। লামা বিয়ে করছে বলেই সে বাঁচল। নইলে সাধারণ লোক হলে হয়তো ওই গুণ্ডাটা তাকে খুনই করে ফেলত।

লামা বললেন : লামাকে খুন করতে পারবে না ?

ছি ছি, কী যে বল! : বলে কানে আঙুল দিলেন সুন্নু আঙমার বাপ। : লামার গায়ে হাত তুলবে ? যত অপদার্থই হোক, এমন কুকর্মে তার সাহস হবে না।

ততক্ষণে নিমা ফিরে এসেছে। বর্ষার আকাশের মতো গম্ভীর তার মুখ। কিছু বলবার আগেই সুন্নু আঙমার বাবা উঠে পড়লেন। দেশীয় প্রথায় বিদায় জানিয়ে তাঁবুর বাইরে গেলেন।

নিমার স্বামী আগ্রহে তখন অধীর হয়ে উঠেছে।

নিমা যা সন্দেহ করছে, লামার মুখে তা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। ওয়াং ডাকের চাকরের কাছ থেকে নিমা খবর এনেছে যে সেই ছোকরা লামা তাকে ডেকে নিয়ে ঐ দূরের পাহাড়ের দিকে গিয়েছিল। তখনও সন্ধ্যা গভীর হয়নি। ফিরেছে একা, অন্ধকারে পা টিপে টিপে। ছোকরা লামা এ কথা অস্বীকার করেছে। বলছে, ওয়াং ডাককে সে চেনেই না। সে একা গিয়েছিল ওই পাহাড়ের দিকে। সেখানে এক গুহায় তার পরিচিত লামা আছেন। তাঁরই সঙ্গে দেখা করে এল।

ছেরিং পেনছো আবার ঝিমিয়ে পড়ল। তবে কোথায় গেল ওয়াং ডাক! এমনি একটা চিন্তা দেখলুম তার চোখে মুখে। নিমা তাকে কী একটা পরামর্শ দিল।

লামা বললেন : বুদ্ধ এ মেয়ের মঙ্গল করবেন। এমন দরদ না থাকলে এরা মায়ের জাত হয়!

বললুম : কী বলল?

লামা বললেন : মশাল জ্বালিয়ে এরা এখন খুঁজতে বেরবে! চাকরদের নিয়ে ছেরিং পেনছো যাবে ওই রি পর্যন্ত। থুরি, রিমানে হিল, পাহাড়।

চলুন না, আমরাও যাই।

না না : বলে বাধা দিলেন লামা, বললেন : তুমি বেরিও না। তোমার পায়ের যন্ত্রণা বাড়লে আমাদের পথ চলাই বন্ধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং আমি যাই।

আমি তাঁদের পৌঁছে দিতে তাঁবুর বাইরে গেলুম। উঃ, কী কনকনে ঠাণ্ডা! সমস্ত শরীর বুঝি হাওয়ায় জমে যাবে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আজ অমাবস্যা নয় তো!

চাকরেরা মশাল জ্বালল দুটো। নিমা এদের আরও কিছু নির্দেশ দিল।

লামা বললেন : কান দুটো খোলা রেখে নিমা চলতে বলছে। পথের ধারে পাথরের আড়ালে কাতরানি শুনে যেন কেউ পালিয়ে না আসে।

গলাটা নামিয়ে বললেন : নিমা সন্দেহ করছে, এ ওই ছোকরা লামারই কীর্তি। লোকটা এদিকের আটঘাট সব জানে। সুযোগ বুঝে কোপ বসিয়েছে।

আমার মুখ দিয়ে একটা অসম্মানের কথা বেরিয়ে গেল। বললুম : এঁরা না ধর্মগুরু!

এ কথার জবাব পেলুম অনেক রাতে, ব্যর্থ হয়ে সবাই যখন ফিরে এলেন। লামা বললেন : ধর্মগুরু নয়, নাটের গুরু। কাল সকালে জানা যাবে, কী চাল ইনি চেলেছেন।

তারপরেই নিজেকে সামলে নিলেন। গুন গুন করে গাইলেন গানের সেই কলি দুটি :

সাঙ্গে লা ছিব্ গিউ নাঙ্গো
টাশী ডিলে ফুন্ সুম্ ছোগ্।

হে বুদ্ধ, অপার তোমার মহিমা। আবার তুমি আমাদের ভিতর এস।

ঘুমু আঙমারা শেষ রাতেই তাঁবু তুলে রওনা হয়ে গেল। আমরা সবাই আজ জেগে ছিলুম। সকলের চোখেই কেমন বিসদৃশ ঠেকল তাদের এই ব্যস্ততা। মনে হল, কোন গর্হিত কাজ প্রকাশ হয়ে পড়বার আগেই তারা পালিয়ে যাচ্ছে। কালও তারা এমনই শেষ রাতে রওনা হয়েছিল। কাক কোকিল জাগবার আগে দুক্রোশ পথ যে অতিক্রম করে ফেলেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সূর্য উঠবার আগেই এতটা পথ এগিয়ে যাওয়া কম কথা নয়। অনেকেই যায়। কিন্তু আমরা আজ তাদের অন্য চোখে দেখলুম। কালো মনের অন্বেষ্টা চোখ যে সন্দেহের ঠুলি-পরা।

সেই অন্ধকারে হাড়-কাঁপানো হাওয়ার ধাক্কা খেয়েও আমরা তাদের যাত্রা দেখছিলুম। আমাদের যে যাওয়া হবে না, নিমা তা রাতেই জানিয়ে দিয়েছিল। নাইবা হল আমাদের জ্ঞাতি কিংবা কুটুম্ব, মানুষ তো! মৃত্যুর মুখে একটা মানুষকে ঠেলে দিয়ে যারা নিজের পথে নির্বিবাদে চলে যায়, তারা আর যাই হোক, মানুষ নয়। সে অপবাদ নিমা কখনও নিতে পারবে না।

দু চোখে ঘুম তখনও জড়িয়ে আছে। ঘুমের আর দোষ কি! সে বেচারা সারাদিন জ্বালাতন করে না, রাতে যখন বাতি নিবিয়ে শুই তখন তার দাবি আছে বইকি! আজ রাতে সে দাবিকে উপেক্ষা করেছি, চোখের পাতা দুটো তাই ভারি হয়ে আছে।

কেন ঘুম এল না জানি না। সে ভয়। বুকের ভিতর শীতের মতো গুড়গুড় করে উঠেছে একটা ভয়। দেশে বুঝি আর ফিরে যেতে পারব না! ওয়াং ডাকের মতো প্রাণ দিয়েই যেতে হবে, নিয়ে যেতে কিছুই পারব না। কীই বা নেবার আছে! 'কৈলাস আর মানস

সরোবরের স্মৃতি তো! কিন্তু এইটুকুই যদি নেবার হয়, তা হলে প্রাণের ভয় কিসের!

কিসের ভয়! যেন বিভীষিকা দেখছি। দেখছি কোন নারী তার আলখাল্লা ছিঁড়ে শাড়ি পরেছে, আর মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলেছে আমার পিছু পিছু। আনন্দে অবশ হল না শরীর, ভয়ে অসাড় হল। চোখের সামনে ছোরা আর তলোয়ারের ফলা ঝলকে উঠল, গাদা বন্দুকের গর্জন শুনলুম কানে। দেখলুম অঞ্জলি ভরে মানুষের রক্ত খাচ্ছে কতকগুলো মানুষের মতো জানোয়ার, আর বিকট দাঁত বার করে হাসছে হা হা করে। দুরন্ত শীতে দেহের উপর ঘাম জমে উঠল রাতের শিশিরের মতো। পেটের ভিতর থেকে একটা যন্ত্রণা ঠেলে উঠল শুকনো গলা পর্যন্ত। এ কী হল আমার!

কদিন ধরেই নিমার পরিবর্তনটা লক্ষ্য করছিলুম। বড়ই স্পষ্ট, লক্ষ্য না করে উপায় নেই। ঘষে ঘষে ঘাড়ের ময়লা তুলেছে যত, তার চেয়ে বেশি তুলেছে মুখের রঙ। তার হাসিটি এখন ভাল লাগে। দাঁতের সারি মুক্তোর মত ঝকঝক না করলেও তাতে আর ময়লা থিতিয়ে নেই আগের মতো। পরিষ্কার হাত দু খানা, পরিষ্কার বাটিতে চা দিচ্ছে। কাল সকালবেলায় লক্ষ্য করেছি, নিমার হাত থেকে চায়ের বাটি নেবার সময় বুড়ো লামার চোখ দুটো হঠাৎ ছলছল করে উঠেছিল। বেশি ভাল লাগলে আমারও চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে।

লামা বলেছিলেন: পরিচ্ছন্ন জীবনের প্রতি সব মানুষেরই সমান লোভ। এরা সেই সংবাদটুকু জানে না বলেই নিজেদের নোংরামি এমন আঁকড়ে আছে।

কিন্তু এই ঘটনাকে এমন সহজভাবে তো সবাই নেবে না। তারা তো এর কদর্থ করবে। আর যার স্বার্থে আঘাত লাগবে সে কী করবে, সেই দুশ্চিন্তাই আমার ঘুমটুকু কেড়ে নিল!

ছেরিং পেনছোকে নিমা সত্যিই সামলেছে। সে লোকটা সরল স্বল্পবুদ্ধি, স্ত্রৈণও বটে। স্ত্রীর অনুগ্রহে যাকে বেঁচে থাকতে হবে, স্ত্রীর

বিরাগের কাজ যে তাকে করতে নেই, এতটুকু বুঝেই সে নিশ্চিন্ত আছে। কিন্তু তার বড় ভাইকে আমি দেখেছি। পুরুষের মতো সে লোকটার আচার ব্যবহার। স্ত্রীর অনাচার সে কিছুতেই সহ্য করবে না। স্ত্রী তার খোঁপা থেকে প্রবাল খুলে ফেলার আগেই প্রতি-দ্বন্দ্বীর মুণ্ড এনে যে স্ত্রীর পায়ে উপঢৌকন দেবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। আমি সেই রক্তমাখা কাটা মুণ্ডটার সঙ্গে নিজের মিল দেখে ভয়ে শিহরে উঠলুম।

অন্ধকারেই সুন্নু আঙমারা চলে গেল। সেই ছোকরা লামার তৎপরতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই নিয়ে এদের মধ্যে আলোচনা হল খানিকটা। কী কথা হল বুঝতে পারলুম না, কিন্তু কথাটা যে তারই সম্বন্ধে হচ্ছে তা ধরতে পারলুম।

এক সময়ে দু হাত বাড়িয়ে লামা নিমাকে আশীর্বাদ করলেন। কেন করলেন তা আমাকেও বুঝিয়ে দিলেন। বললেন: একটা কথা সত্যি বলেছে ওই ছোকরা লামা। মানুষকে ভালবাসলেই বুদ্ধকেও ভালবাসা হয়। সে ভালবাসা স্বার্থে নয়, প্রতিদানেব আশায় নয়, দেহের লোভে নয়। সে ভালবাসা শুধু ভালবাসার জন্যেই। শুধু পরিজনের দুঃখেই অন্তর কাঁদবে না, কাঁদবে প্রতিবাসীর দুঃখে, কাঁদবে দেশবাসীর দুঃখে, কাঁদবে বিশ্ববাসীর দুঃখে। সেই তো সত্যিকাব ভালবাসা। ওয়াং ডাক নিমার দেশবাসী, তুমি অন্য দেশেব লোক। তোমাদের দুঃখে তার প্রাণ কেঁদেছে, এই তো মানুষের সত্যিকার পরিচয়!

বাকি রাতটুকু আমরা গল্প করেই কাটালুম।

পূর্বের নির্মেঘ আকাশে এক সময় আলোর ছোঁয়া লাগল। সামনের পাহাড়টার গায়ে থিতনো অন্ধকার এল ফিকে হয়ে। ছেরিং পেনছোর ধৈর্য আর কিছুতেই মানছিল না। এবারে আগ্রহে লাফিয়ে উঠল। নিমা যা বলল, লামা তার অর্থ আমাকে শোনালেন। বললেন, পাহাড়ের পেছনটা দেখতে আমাদের যেন ভুল না হয়। নিরস্ত্র

লোকের অস্ত্র হল তার হাত দুটো। সে দুটো দিয়ে অতর্কিতে ধাক্কা দিলে বন্দুকধারী বীরও প্রথমটায় কাবু হয়। আর ওই পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়লে ওয়াং ডাকের একটা পাঁজরাও আস্ত থাকবে না।

কী আশ্চর্য। পাহাড়ের পিছনেই আমরা ওয়াং ডাককে খুঁজে পেলুম। চুড়ো থেকে হাত দশেক নিচে একটা বড় পাথরে আটকে আছে, আর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। উপর থেকেই তার কাতরানির শব্দ আমরা শুনতে পেয়েছিলুম। এই দশ হাত এমনি খাড়া যে নেমে তাকে তুলে আনবার উপায় নেই। ওই পাথরটা না থাকলে কোথায় যে পড়ত, তা ভাবতেই পায়ের গোছটা আলগা হয়ে গেল। মনে হল, নিজেই বুঝি পড়ে যাচ্ছি।

সবচেয়ে আশ্চর্য হলুম ওয়াং ডাকের চাকরটাকে দেখে। লোকটা আগেই এখানে পৌঁছেছে, আর পাগলের মতো চেষ্টা করছে ওই জায়-গাটায় পৌঁছবার জন্য। লামা তাকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। তা না হলে আর একটা দুর্ঘটনা ঘটতে দেরি হত না।

কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া দক্ষিণ থেকে বইছে। হাত পা তখনও অসাড় হয়ে আছে। অসহায়ভাবে আমরা যখন নিজেদের কর্তব্য ভাবছি, কর্তব্য স্থির করে দিল ওয়াং ডাকেরই চাকর। আনন্দে লামা তার পিঠ ঠুকে দিতেই লোকটা ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালুম লামার দিকে। বুড়ো হেসে বললেন: লোকটার বুদ্ধি আছে। একগাছা মোটা কাছি আনতে গেছে। ওয়াং ডাক যদি শক্ত করে ধরতে পারে আমরা তাকে টেনে তুলব।

এমন কিছু বুদ্ধিমানের মতো কথা নয়, কিন্তু বুদ্ধিটা কারও মাথাতেই এতক্ষণ আসে নি ভেবে সকলেই আশ্চর্য হলুম।

অল্পক্ষণেই হাঁপাতে হাঁপাতে লোকটা ফিরে এল। ক্লান্তিতে কাহিল হয়েছে যত, আনন্দে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তার চেয়ে বেশি। এই

আন্তরিকতাটুকু লক্ষ্য করে লামা তাঁর মনের ভাব গোপন করতে চাইলেন না। বললেন : এর প্রভুভক্তি লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই। সারা-রাত হয়তো ঘুমোয় নি লোকটা। অথচ ইচ্ছে করলেই প্রভুর সব কিছু আত্মসাৎ করে গ্যাকার্কোর মণ্ডিতে পারত হারিয়ে যেতে। ওয়াং ডাককে খুঁজে পেলেও একে আমরা খুঁজে পেতুম না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম : অসভ্যদের ওপর বুদ্ধের আশীর্বাদ এটা।

টেনেই তোলা হল ওয়াং ডাককে। সমতল জায়গার উপর শুইয়ে লামা তার সমস্ত শরীরটা পরীক্ষা করে দেখলেন। উপুড় করে শুইয়ে প্রথমেই তার মেরুদণ্ডটা পরীক্ষা করলেন। ডান হাতের দুটো আঙুল দিয়ে মেরুদণ্ডের প্রতিটি হাড় দেখে নিলেন নিচে থেকে উপর অবধি। তারপর দেখলেন বুকের পাঁজরাগুলো, পা আর হাত। রায় দিলেন, ভাঙে নি কিছুই। ওয়াং ডাক তার বুকের হাড় দেখাল হাত দিয়ে। লোকটা বুক দিয়ে বোধ হয় পড়েছে। ব্যথায় টনটন করছে, জানাল ইশারায়। আমরা তাকে চ্যাঙদোলা করে নিজেদের আড্ডায় নিয়ে এলুম।

নিমা তার স্বাভাবিক নিপুণ হাতে কী একটা শিকড় ছেঁচা দিয়ে ওয়াং ডাকের ক্ষতস্থানগুলো বেঁধে দিল। তার চাকর কোথা থেকে খানিকটা পচা তেল এনেছিল। সেই দুর্গন্ধ পুরনো তেল মেয়েটা সারা দুপুর তার বুকে পিঠে মালিশ করে দিল। ছোট ছোট চোখে ড্যাব ড্যাব করে ওয়াং ডাক চেয়ে রইল। একটু বোঁজবার চেষ্টা করতেই ঠাণ্ডা জলের ছিটে খেয়ে হকচকিয়ে গেল বার বার।

সারা দিনের পর বিকেলবেলায় ওয়াং ডাক কথা কইল। বড় ধীরে ধীরে হাঁপাতে হাঁপাতে কথা কটি বলল। লামা বললেন : আমরা যা মনে মনে ভেবেছি, তাই ঠিক। সেই ছোকরা লামাই ওয়াং ডাককে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, পাহাড়ের অপর পারে এক তপস্বী লামা আছেন, বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ। তিনি আশীর্বাদ করলে কারও কোন

আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে না। ওয়াং ডাক লেখাপড়া শেখে নি, সোজা কথার বাঁকা মানে জানে না। বলল, বেশ তো, সেইখানেই আমাকে নিয়ে চল। শত্রুতা ভুলে পরম আশ্বাসে পথ চলতে চলতে লামার মিষ্টি কথায় মুগ্ধ হল ওয়াং ডাক। আর তার ফল পেতেও দেরি হল না। লামা এই মুলুকেরই লোক, আর ওয়াং ডাকের পরিচয় নেই এদিকের পথঘাটের সঙ্গে। ভাবল, পাহাড়ের ওধারে হয়তো লোকালয় আছে। তাই নির্বিবাদে উঠে এল চুড়োর ওপর। তার পর—তার পরের ঘটনা আমাদের জানা। চোখ বুঁজে সারারাত আমরা এই দুঃস্বপ্ন দেখেছি। বলতে বলতেই ওয়াং ডাক উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বলল, লক্ষ্মী-ছাড়ার দুরভিসন্ধির কথা এক মুহূর্ত আগে টের পেলে বন্দুকের আঘাতে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিত। মানুষকে আর বিশ্বাস করা যাবে না। দুঃখ করে ওয়াং ডাক বলছে, মানুষের মতো অবিশ্বাসী নেই দুনিয়ায়। চরম দুর্ঘটনা ঘটাবার আগেও পরম বন্ধু সাজতে পারে কপট মানুষ।

আমাদের করবার কিছুই নেই। কিন্তু ছেরিং পেনছোর মাথায় খুন চেপে গেল। এ অন্যায়ের প্রতিশোধ না নিয়ে সে ফিরবে না। ওয়াং ডাকের সঙ্গে কি কথা হল খানিকক্ষণ, তা শুনে লামা হেসে যেন গড়িয়ে পড়লেন। রহস্য এমন একটা জিনিস, যা হারালে রাজ্য হারানোর মতো দুঃখ হয়। রহস্যের লোভে আমি আজে বাজে সমস্ত বই পড়ি। যে বন্ধু রহস্যে পটু, সন্ধ্যেবেলায় তার আড্ডায় গিয়ে জমে যাই। এমন একটা রহস্যের কথা ধরতে না পেরে মনটা ভারি খারাপ লাগল। লামা একটু সামলে নিয়ে বললেন : তোমাকে না বললে আনন্দ আমার সম্পূর্ণ হয় না দেখছি।

প্রীতি তা হলে গভীর হয়েছে বলুন।

লামা হেসে বললেন : ওয়াং ডাকের বন্দুকটা ছেরিং পেনছো ধার চাইছিল। বলল, এইটে দিয়ে সেই ছোকরা গুণ্ডাটাকে শেষ করে আসবে। ওয়াং ডাক দুঃখ করে বলল, ওটা দেখবার জিনিস, ওটাতে

আজকাল আর কাজ হয় না। ওর ঠাকুরদা ব্যবহার করতেন বন্দুকটা ওর বাবা ওকে ওটা ব্যবহার করতে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন ওটা সোজা না গিয়ে অনেক সময় পেছনেও আসে, আর বন্দুকধারীকে জখম করে। সেই জন্যে বন্দুকটাকে আজকাল লাঠির মতো ব্যবহা করে। লোহাটা ভারি তো, একবার মাথায় পড়লে আর র নেই। তা ছাড়া বন্দুক একটা আছে, এইটে দেখেই অনেকে ভ পায়।

বলে লামা আবার হাসতে লাগলেন।

ওয়াং ডাক লজ্জিত হয়েছে বলে মনে হল। ছেরিং পেনছো কি অ কিছুর বায়না ধরেছে! অনুমান মিথ্যে নয়। লামা বললেন: এবা তার ঘোড়াটা চাইছে। বলছে, হেঁটে কিংবা ইয়াকে চড়ে গেলে লক্ষ্মীছাড়াকে আর ধরা যাবে না। গ্যাকার্কোর মণ্ডিতেই হবে মুশকিল! শ দুই তাঁবু নিশ্চয়ই সেখানে পড়েছে, খুঁজে বার করাই দুঃসাধ্য। তারপব রেতাপুরী! একবার সেখানে পৌঁছে গেলে লামার রাজ্যে লামাকে ধরা একরকম অসম্ভব ব্যাপার। তা একটা থাকলে বেশ তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়।

ঘোড়া দিতে ওয়াং ডাকের আপত্তি ছিল না। কিন্তু সন্দেহ ছিল তার পৌরুষে। বলল, দুটো দিন অপেক্ষা করলেই ভাল ছিল। সে নিজেই এর প্রতিশোধ নিতে পারত। কোথাও গিয়ে ও পাপী নিস্তার পাবে না। দরকার হলে নরকে গিয়েও একবার তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে।

উত্তেজিত ভাবে এতগুলো কথা বলে লোকটা হাঁপাতে লাগল। লামা তার বুকে হাত বোলাতে বোলাতে আমাকে মানে বললেন।

ঘোড়াটা পেয়েই ছেরিং পেনছো ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল। নিমা তাকে ধরে ফেলল। বলল: এতে রাতে কোথায় যাচ্ছ? কোথায় খুঁজবে তাকে এই অন্ধকারে?

হাত ধরে টেনে তাকে বসিয়ে দিল, বলল: তার চেয়ে আজ সকাল

সকাল খেয়ে নাও। ওয়াং ডাক ভাল থাকলে কাল ভোরেই আমরা যাত্রা করব।

নিমা বেরিয়ে গেল। ছেরিং পেনছো নিষ্ফল আক্রোশে শুধু গজরাতে লাগল।

লামা বললেন: দেখছ তো লোকটাকে। স্ত্রীর শাসন ডিঙিয়ে তার এক পাও নড়বার ক্ষমতা নেই।

আমি ওয়াং ডাকের কথা জিজ্ঞাসা করলুম: কেমন দেখছেন ওয়াং ডাককে? কাল পথ চলতে পারবে তো?

লামা বললেন: হয়তো পারবে, কিন্তু বন্দুকের খোঁচায় যে ক্ষতটা হয়েছে, সেটা গভীর। সেটা সারতে সময় লাগবে। অসাবধান হলে পেকেও উঠতে পারে।

তারপরে বললেন: কী সাংঘাতিক ব্যাপার বল! লামারা এমন নিষ্ঠুর হতে পারে, এ আমি ভাবতেও পারি নে! বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা নিয়ে এমন হিংসার কাজ করতে পারে নিজের সামান্য স্বার্থে! তার আগে পৃথিবীটা মরে গেল না!

একটু থেমে বললেন: কাল যখন নিমা আমাদের এমনই এক আশঙ্কার কথা বলছিল, আমাব বিশ্বাস হয় নি। সত্যি বলছি তোমাকে, বেশ একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিলুম মেয়েটার ওপর। ধর্মগুরুব সম্বন্ধে এমন ধারণা থাকাও যে পাপ। এখন দেখছি, এ দেশের মেয়েপুরুষ আমাদের চেয়ে ভাল করে চেনে তাদের ধর্মগুরুদের।

গলাটা একটু নামিয়ে বললেন: কাল রাতে দুঃখে আর দুশ্চিন্তায় আমিও এদের সম্বন্ধে একটা অসম্মানজনক কথা বলেছিলুম। সেই অসংযমের জন্যে রাত্রে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি।

আর তো ধিক্কার দেবার প্রয়োজন নেই।

লামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: এখনও দিচ্ছি। তবে নিজেকে নয়, নিজের সম্প্রদায়কে। বুদ্ধকে আমরা অপমান করেছি।

দুঃখে ও বেদনায় বৃদ্ধের দু চোখ হঠাৎ ছলছল করে উঠল।

বারো

পরদিন সকালে ছেরিং পেনছোকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না ওয়াং ডাকের ঘোড়াটাও। ব্যাপারটা বুঝতে কারও বাকি ছিল না, তবু ওয়াং ডাকের চাকরের কাছে অনুমানটার সমর্থন নেওয়া গেল। শেষ রাতেই সে বেরিয়ে গেছে। বলে গেছে, নরাধমের মুণ্ডুটা যদি সে নিতে পারে, তবেই আসবে ঘোড়া ফেরৎ দিতে। তা না হলে পোড়ামুখ দেখাতে সে আর ফিরবে না। পথের ধারে ঘোড়াটা যেন তারা খুঁজে নেয়।

এই কথা শোনবার সময় নিমার দু চোখ জলে ভরে এসেছিল। বলেছিল : বড় সরল ছেলে, বড় ভাল। কিন্তু ক্ষেপে গেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হয় খুন হবে নিজে, নয় খুন করে ফিরবে।

বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। লামা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক খবর যোগাড় করলেন। নিমার পারিবারিক খবর। সমস্ত কথা খুলে বলতে এতটুকু দ্বিধা হল না তার। ওয়াং ডাক মাঝে মাঝেই কথা বলছিল। তার বক্তব্য না বুঝলেও এটুকু বুঝেছিলুম যে সে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে।

পরে আমাকে নিমার গল্প লামা শুনিয়েছিলেন। একুশ বছর বয়সে নিমার বিয়ে হয়েছিল। ভাল সম্বন্ধ এসেছিল গোটাকয়েক। তার ভিতর দুটোর কথা তার মনে আছে। একই গ্রামের দু তিনটি রোজগেরে যুবক একসঙ্গে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আর একটি সম্বন্ধ ছিল এর চেয়েও ভাল। এক বর্ধিষ্ণু ঘরের একমাত্র ছেলে, বেশ প্রতিপত্তিশালী। কিন্তু নিমার বাবা রাজী হলেন না। বলেছিলেন,

দু তিনটি ঘরের বউ হয়ে যাওয়ার বিপদ আছে। স্বার্থে আঘাত লাগলেই বন্ধুদের বন্ধুতা ভেঙে যাবে। তারপর বিবাহ-বিচ্ছেদ। আর বড়লোকের ঘরে দিলেন মা এই ভেবে যে তাতে মেয়ে নষ্ট হবে। তার নানারকম বন্ধুবান্ধব আসবে। তারপর স্বামীকে বশ করতে পারলেই মেয়ে যে আরও দুটো বিয়ে করে ফেলবে তাতে সন্দেহ নেই। এমন ঘটনা তো হামেশাই ঘটছে। এতে সমাজের বাধা যেমন নেই, নিন্দেও তেমনই কেউ করে না।

নিমার বাবা তার বর্তমান সম্বন্ধটাই পছন্দ করলেন। বড় ভাইএর বয়স তখন বছর পঁচিশেক। এক পরিবারের চার ভাই তারা। মেজো তার সমবয়সী, সেজ বছর কয়েকের ছোট, আর ছোটর বয়স বছর দুই। সদ্য এদের মা মারা গেছে। তাদের বাপ নিজে বিয়ে না করে ছেলের বিয়ে দিচ্ছিলেন। দেশের প্রথামত এসব ক্ষেত্রে যে মেয়েই ঘরের বউ হয়ে আসুক না, তার উপর বাড়ির সব পুরুষেরই সমান অধিকার। বাপে বিয়ে করলেও ছেলেদের দাবি, আর ছেলেরা বিয়ে করলে বাপের। এখানেই নিমার বাবার একটু অপছন্দ ছিল, কিন্তু ভগবানের বিধান অন্য। বিয়ের ঠিক পরেই তার শ্বশুরের মৃত্যু হল। সুস্থ সবলদেহ লোকটা হঠাৎ কী করে মরল, এই নিয়ে বেশ একটু সোরগোল পড়েছিল। আজ স্বীকার করতে নিমার লজ্জা নেই, নিমা এতে সুখীই হয়েছিল। দুরন্ত একটা ভয় নিয়ে সে আসছিল সংসার করতে। পথেই যখন তার রাশভারী শ্বশুরের মৃত্যু হল, তার মনে হল, তার বুকের উপর থেকে একখানা পাথর হঠাৎ নেমে গেল।

এই স্বামীদের সঙ্গে তার অদ্ভুত সম্বন্ধ। স্বামী বলে তার উপর কর্তৃত্ব করে তার বড় স্বামী। টাকা পয়সার বেলায় কিন্তু নিমা তাকেও আমল দেয় না। রোজগারের শেষ নয়া পয়সাটি পর্যন্ত তার হাতে তুলে দিতে হবে, আর প্রত্যেকটি কাজ তার পরামর্শ নিয়ে করতে হবে। মেজোর সঙ্গে তার সম্বন্ধ বড় মধুর, ঠিক বন্ধুর মতো। কর্তৃত্ব নিয়ে তাদের বিবাদ হল না কোনদিন। ছোট দুটি ছেলেকে

সে নিজের হাতে মানুষ করে তুলেছে। ছোটটা তো তাকে মা বলেই ডাকে। আর ডাকবে না-ই বা কেন। এ দেশে অনেক স্বামীই তো স্ত্রীকে মা বলে। এতে তাদের শ্রদ্ধা আর ভালবাসাই প্রকাশ পায়।

আজ আট বছর ধরে এই দুটো ছেলেকে সে মানুষ করছে। নিজের ছেলের অভাব সে কোন দিন মনে করে নি। একুশ বছর বয়সে একটা দু বছরের পুত্র পেলে তাকে নিজের ছেলেই তো মনে হবে। সেটাকেও তার স্বামী কেড়ে নিয়ে গেছে। ছোটটা যেমন তাকে ভয় পায় না, সেজটা তেমনই তার ভয়েই যেন সারাদিন লুকিয়ে বেড়ায়। বড় হয়ে অবধি ভাবে, কোন দোষ করলেই নিমা তাকে তাড়িয়ে দেবে। বোঝে না তার হৃদয় তারা কী ভাবে জয় করে আছে। তার মুখের কথা ঠেলে ফেলবার সাহস নেই বলে সকালে ঘুম থেকে ওঠবার আগেই ছেলেটা পালিয়ে গেছে। বুদ্ধ কি তাকে রক্ষা করবেন না?

হাউ হাউ করে নিমা কেঁদে উঠল। এক রকমের বন্য কান্না। লামা দু হাত বাড়িয়ে তার মাথার উপর রাখলেন। মাথা নিচু করে নিমা এই ছিন লাপ গ্রহণ করল। এঁর আশীর্বাদ ব্যর্থ হবে না, এমনই বিশ্বাস নিমার দৃঢ় হয়েছে।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি। কত বড় মূর্খের মতো আমি নিমার সম্বন্ধে নানা কথা ভেবে ভয়ে ও ভাবনায় কণ্টকিত হয়ে উঠেছিলুম কাল রাতে। নিজের হৃদয়টাকে এমন সহজ ভাবে তুলে না ধরলে তার অন্তরের সংবাদ আমাদের অবিদিতই থেকে যেত।

ওয়াং ডাককে তার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করা হল। হয়তো ভাল ছিল না, হয়তো বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল একান্তভাবে, কিন্তু শুয়ে থাকতে সে রাজী হল না। বলল, ইয়াকের পিঠে চড়ে সে অনায়াসে পথ চলতে পারবে। গ্যাকার্কোর মণ্ডি আর বেশী দূর নয়। কিছু কিছু গম আর বার্লির চাষ দেখেছে আশেপাশে, পাহাড়ের গুহায়

লোকের বাসও দেখেছে কাল রাতে। কাজেই গ্যাকার্কো যে দূর নয়, সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হয়েছে।

তার দুঃখের কথাও গোপন রাখল না। বলল, দেশ ছেড়ে অবধি ওই মায়াবিনী মেয়েটার জন্যেই তার সমস্ত পরিশ্রম নষ্ট হয়েছে। গ্যানিমার মণ্ডিতে তার কাজ হল না একেবারে। নানা অজুহাতে পথে ঘাটে সময় নষ্ট করে মণ্ডিতে মেয়েটা দুদিনও রইল না। ইয়াকের লেজের চামর বেচে কিছু প্রবাল কিনবে বলে এতদূর এসেছে। প্রবালের দাম করতে করতেই মেয়েটা রওনা হয়ে গেল। প্রবাল পড়ে রইল, এখনও সে চামর বয়ে চলেছে। একটু দম নিয়ে বলল, ব্যবসার দিন তো ফুরিয়ে এসেছে, মণ্ডি ভেঙে গেছে দেখলেও সে আর আশ্চর্য হবে না। এত কষ্টে পথশ্রম স্বীকার করে আসা, সবই একটা মেয়ের জন্যে নষ্ট হয়ে গেল।

বড় রকমের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওয়াং ডাক। তারপর লামাকে যা বলল, তার মানে শুনলুম এই রকম। বলল, সবই ভাগ্য। তা না হলে ছেরিং পেনছোর মতো একটা অপদার্থের জন্য নিমার মতো মেয়ে কেঁদে ভাসায়। আর যার জন্যে সে তার নিজের জীবনটা দিল অসং-কোচে, সে কিনা তাকে লাথি মেরে যায় পথের উপর!

লামা দু হাত বাড়িয়ে তাকেও আশীর্বাদ করলেন।

আমাদের যাত্রার আয়োজন হল। সকালের সোনালি রোদ এসে সব কিছু ছুঁয়ে গেছে। পথের উপর শিশিরবিন্দু আর জমে নেই। বাতাসের ফলা ভোঁতা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সংকীর্ণ বন্ধুর পথ ক্রমেই উপরে উঠে যাচ্ছে। ওই উঁচু পাহাড়টা বাঁ হাতে ফেলে আমাদের এগোতে হবে। এখন আমরা সোজা উত্তরে চলেছি। সূর্য উঠেছে ডান হাতে। স্থানে স্থানে চাষের লক্ষণ দেখছি, হরিৎ রঙের শিষ উঠেছে ক্ষেতে। দক্ষিণ থেকে বাতাস এসে উত্তরে তাদের নুইয়ে দিচ্ছে।

আজ তাকাতে বেশ ভাল লাগছে। অনেকদিনের রুক্ষতার পর

এই শ্যামলিমাটুকু তৃপ্তি দিচ্ছে ক্লান্ত চোখ ছুটোকে। উত্তাপে আর রুক্ষতায় বুঝি চোখের শিরায় আগুন লাগে। এতদিন কেন চোখ বুঁজে আমরা চলতুম? আজ সারাদিন আমরা তাকিয়েই থাকব।

পাহাড়টি বাঁয়ে রেখে এগিয়ে যাবার সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলুম। ঠিক এমনটি আগে কোথাও দেখি নি। মনে হল, পাহাড় কুরে কুরে মানুষ তার ভিতর বাসা বেঁধেছে। দীর্ঘদিন ধরে এতটা পথ আমরা উত্তীর্ণ হয়ে এলুম। কত নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, কিন্তু ঠিক এমনটি কোথাও দেখি নি।

লামা আমার কৌতূহল লক্ষ্য করছেন। বললেন: এ একটি গ্রাম। আমিও যখন এমনই একটি তিব্বতী গ্রাম প্রথম দেখেছিলুম তখন তোমারই মতো ছু চোখ মেলে অনেকক্ষণ চেয়েছিলুম। এমন অপূর্ব জিনিস মনে হয়েছিল পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

ইয়াকের পিঠে ওয়াং ডাকের সঙ্গে গল্প করতে করতে নিমা এগিয়ে গেল। আমি ও লামা পিছিয়ে পড়লুম। এমন একটা জিনিস ভাল করে না দেখে কি যেতে পারি।

লামা বললেন: এ দেশে কাঠখড় তো নেই। কাঠ বলতে নেপাল যেতে হবে, নয় তো ভারতের টেহ্‌রি গাড়োয়াল। সে কি সম্ভব এ দেশের গরিবদের পক্ষে? যা সম্ভব, তা হচ্ছে এই পাহাড় কেটে কেটে মৌচাকের মতো গুহা তৈরি করা। পাহাড় খুঁড়লে বালি-মাটি পাওয়া যায়। তাই দিয়ে নিকিয়ে পালিশ করে এরা সুন্দর ঘর করে।

কতকগুলো ঘরের সামনে দরজা নেই, পর্দা ঝুলছে। তারই ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ভিতরটাও দেখে নিলুম। তোফা থাকবার ব্যবস্থা। লামা বললেন: কুলি মজুর চাষী সন্ন্যাসী সবাই থাকে এমনই পাহাড়ের ঘরে।

আশ্চর্য হয়ে বললুম: সন্ন্যাসীও থাকেন? সন্ন্যাসী তো এ দেশের শাসক সম্প্রদায়।

লামা বললেন: দেশসুদ্ধ লোক যদি লামা হয়, তা হলে দেশটাকেই

একটা বিরাট মঠ করতে হবে। তা না হলে অত লামার জায়গা হবে কোথায়?

সে কথা সত্য।

আবার পথ চলতে চলতে লামা বললেন: আমার খুব শখ, এমনই পথ অতিক্রম করবার সময় হঠাৎ যদি কোন সত্যিকার তপস্বীর সাক্ষাৎ পেয়ে যাই। শুনেছি এ দেশে মহাপুরুষের অভাব নেই। দুর্গম পাহাড়ের ওপর বরফের আসনে বসে সাধনা করছেন যোগসিদ্ধ পুরুষ। ত্রিকালজ্ঞ তাঁরা, বুদ্ধের সাক্ষাৎ পেয়েছেন জ্ঞানের গভীরতায়। কী অপূর্ব বল!

লামার ছোট ছোট চোখ দুটো আনন্দে ও শ্রদ্ধায় জ্বলজ্বল করে উঠল।

খানিকক্ষণ থেমে বললেন: তোমাদের কথাও আমি শুনেছি। তোমাদের ভেতরেও আছেন এমন অগণিত সাধু-সন্ন্যাসী যাঁরা লোক-চক্ষুর অন্তরালে তপস্যা করে চলেছেন অনাদিকাল থেকে। শুনেছি হরিদ্বার থেকে দুর্গম পাহাড়ের দিকে ধাপে ধাপে আছেন সন্ন্যাসী। কেউ গঙ্গার ধারে ভস্ম মেখে ভণ্ডামি করছে, কেউ দূরান্তর থেকে এসে ওই ভণ্ডদের সঙ্গে হাত পেতে আহার নিয়ে যাচ্ছে সাধু-সন্তদের ভোজনালয় থেকে। এদের চেয়েও উপরে থাকেন যাঁরা, তাঁদের আহার-নিদ্রার প্রয়োজন গেছে ফুরিয়ে। মানুষের শরীরে অতিমানুষ তাঁরা। মানুষ আর ভগবানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে আছেন লোকোত্তর সাধনায়।

মনের চোখ বুঁজে নিঃশব্দে প্রণাম করলুম সেই মহাপুরুষদের।

লামা একসময় হালকা কথার ভিতর এলেন। প্রশ্ন করলেন: মহাপুরুষ দেখেছ কখন?

সাহিত্যিক ও দেশনেতা দুএকজনকে দেখেছি। তাঁদেরও আমরা মহাপুরুষ বলি। তেমন মহাপুরুষ দেশে অনেক আছেন। লামা নিশ্চয়ই এসব মহাপুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন না। ভাবতে

লাগলুম ত্রৈলঙ্গস্বামী বা গন্ধবাবার মতো মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি কিনা।

লামা তাড়া দিলেন, বললেন : এতটা পথ এলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। একজন মহাপুরুষেরও সাক্ষাৎ পেলে না, এমনই পাপী তুমি !

তাড়া খেয়ে হঠাৎ সেই গুহার তপস্বীর কথা মনে পড়ল। পথ হারাবার আগে তিনি আমাকে দেশে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করেই এই বিপর্যয় এনেছি ডেকে। প্রথমেই ডাকাতের হাতে পড়ে সর্বস্ব খোয়ালুম। তারপর পথ হারিয়ে আজকের এই দুরবস্থা। কিন্তু এইখানেই কি দুর্ভাগ্যের শেষ হয়ে গেল? এর পরে যদি সেই রকম কোন দুর্ঘটনা ঘটে, রাতের অন্ধকারে যার স্বপ্ন দেখে আমি ঘেমে উঠি ! সেই মহাপুরুষ কি সেদিন তাঁর মানসচক্ষে এমনই কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলেন? এক রকমের অদ্ভুত ভয় আমার কণ্ঠনালী ঠেলে উঠল।

লামা বললেন : কিছু বলবে মনে হচ্ছে।

গল্পটা তাঁকে বললুম।

অনেকক্ষণ তিনি কোন কথা বললেন না।

এবারে আমি বললুম : কিছু বলবেন মনে হচ্ছে !

আমি ভুল করেছি, এ কথা লামা বললেন না। বললেন : সবই বুদ্ধের ইচ্ছা। তাঁর নির্দেশ এড়িয়ে যাবে এমন শক্তি তোমার কোথায় !

বেলা বাড়ছে। উত্তাপও বাড়ছে। আর বাড়ছে বাতাসের বেগ। সেই বেগ শিরার রক্তে দোলা দিচ্ছে। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে চলবার পর বললুম : আমার কি ফিরে যাবার আর পথ নেই ?

লামা বললেন : পথ তোমার পেছনেই পড়ে আছে। সেই দুস্তর দুর্গম পথ। নিঃসম্বল তুমি কার ভরসায় এতটা পথ পাড়ি দেবে ?

বললুম : একখানা কম্বল আর কিছু অর্থ পেলেই ফিরে যেতে পারব। আমি কথা দিচ্ছি, দেশে ফিরেই আমি তা ফেরত পাঠিয়ে দেব।

লামা রসিয়ে রসিয়ে হাসলেন। আমিও আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। প্রাণের উচ্ছ্বাসে যা বলেছি, তা নিজের দেশেই সম্ভব। এ দেশে কে আসবে আমার ঋণ শোধ করতে, আর এই দলটিকে কোথায় খুঁজে পাব।

আমার অপ্রতিভ ভাব লক্ষ্য করে বললেন: ফিরে যাবার জন্যে অর্থ আর শীত-বস্ত্রের অভাব তোমার হবে না, আর এরা ফেরতও চাইবে না। আমিই আমার ঝোলাঝুলি তোমাকে দিতে পারব। কিন্তু তোমার প্রশ্ন হল অন্য রকম। এই যে এতটা পথ এলে, পায়ের চিহ্ন কি রেখে আসতে পেরেছ পাথর আর বরফের ওপর? কী দেখে সেই পুরনো পথে ফিরবে?

একটু থেমে বললেন: তার চেয়ে যে পথে চলেছ চল। আজ কিংবা কাল আমরা গ্যাকার্কোর মণ্ডিতে পৌঁছে যাব। সেখানে অনেক ভারতীয় পাবে, যারা বাণিজ্য শেষ করে সোজা দেশে ফিরবে। তাদেরই কোন দলের সঙ্গে ভিড়ে যেও। তারা তোমার নিজের দেশের লোক, আনন্দ করে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

হাতে যেন স্বর্গ পেলুম। তারপরেই দুঃখে মনটা ম্লান হয়ে গেল। সেই পুরনো ভাবনা—এত কষ্ট স্বীকার করে এসে শেষে একটা মণ্ডি থেকে ফিরে যাব? কৈলাস আর মানস সরোবর দেখতে পাব না! ওয়াং ডাকের ইয়াকের পাশে নিমা পায়ে হেঁটে চলেছে, চলার আনন্দে উচ্ছল জলতরঙ্গের মতো। ওরাও দেখবে ছো মাফাম্ আর খাং রিমপোছে।

প্রাণের মায়ার সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেধেছে সৌন্দর্যচেতনার। পুরুষ হয়ে প্রাণের ভয়ে উপেক্ষা করব এই রূপ-রস-গন্ধভরা সুন্দর পৃথিবীটাকে!

সামনে থেকে রিন ঠিন শব্দ আসছে অবিশ্রাম। ওকি নিমার পায়ের মঞ্জীর, না ইয়াকের গলার ঘণ্টা!

তেরো

দুপুরেই নিমা যাত্রাভঙ্গ করতে চেয়েছিল। অসুস্থ লোকের একদিনে বেশি পথ চলা উচিত হবে না। কিন্তু ওয়াং ডাক রাজী হয় নি। বলেছিল, গড়িয়ে গড়িয়ে হলেও গ্যাকার্কোর মণ্ডিতে তাকে পৌঁছতেই হবে। চামরগুলো বেচতে না পারলে দেশে ফিরবার রেস্ত তার থাকবে না। নীল প্রবাল না পাক, কিছু লাল আর সাদা প্রবালই তাকে নিতে হবে। এবারে আর মেয়েদের মায়ায় ভুলবে না। ইয়াকের পেটে লাম্‌খোর খোঁচা মেরে অসুস্থ ওয়াং ডাক এগিয়ে চলল। আমরাও চললুম।

বেলা তখন পড়ে আসছে। দূরের দিগন্তে মনে হল সাদা বকের ঝাঁক পাখা মেলে রোদ পোয়াচ্ছে। ওয়াং ডাকের আনন্দ আর ধরে না। বলল : ওই তো গ্যাকার্কোর মণ্ডি দেখা যাচ্ছে।

আর খানিকটা এগোবার পর ওই পাখামেলা বকগুলো স্পষ্ট হল। অসংখ্য তাঁবু পড়েছে একটা বিরাট ময়দানে। সন্ধ্যার আগে ওইখানেই আমাদের পৌঁছতে হবে।

এক সময়ে নিমা হঠাৎ হেসে উঠল। লামা বিভ্রান্ত হলেন। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ হাসে কেন মেয়েটা! জিজ্ঞাসা করে যা জানলেন, আমাকেও তা শোনালেন। নিমা বলল : গ্যানিমা থেকে জোরে একটা ঢিল ছুঁড়লে হয়তো গ্যাকার্কো এসে পড়বে। অথচ এই পথটুকু পার হতে আমরা বুড়িয়ে গেলুম।

গ্যানিমার মণ্ডি ছেড়ে খানিকটা পথ এগিয়ে তার স্বামীকে ফিরে যেতে হয়েছিল। কী একটা হিসেবের ভুল ধরা পড়তেই আবার তাকে পিছু হটতে হল। এরা ভেবেছিল রাতেই সে ফিরে আসবে, কিন্তু তা এল না। এল পরদিন দুপুরবেলায়। আর এসেই বলল, চল। কিন্তু চল বললেই কি চলা যায়। গোটাকয়েক ইয়াক তাদের হারিয়ে গেছে।

ঠিক হারিয়ে যাওয়া নয়, চরতে গেছে। সারাদিন তারা চলে, সারারাত চরে খায়। সকালবেলা সূর্য ওঠার আগে তাদের বেঁধে এনে যাত্রা শুরু করতে হয়। এই এ দেশের রীতি। আজ সকালে তার দরকার হয় নি। কে জানত যে, দুপুরে আবার তাদের যাত্রা করতে হবে! গণ্ডগোল বাধল সেই ইয়াক খুঁজতে বেরিয়ে। ইয়াকগুলোর সঙ্গে একটা অচেতন মানুষও পাওয়া গেল। তার পরের ঘটনা লামা আমাকে বলেছেন।

সাদা তাঁবুগুলো ক্রমেই এগিয়ে আসছে। লামা বললেন: ওই ভিড়ের ভেতরে ঢুকে আর কী হবে! বাইরেই রাত কাটানো যাক।

নিমার ইচ্ছা ছিল ভিতরে ঢোকবার। তার সেজ স্বামীটা গোঁয়ারের মতো বাড়ি ছেড়ে গেছে। তার জন্যেই ভাবনা বেশি। এত কাছে এসে তাকে খুঁজে বার করবার একটা চেষ্টা করবে না?

যন্ত্রণায় ও ক্লান্তিতে ওয়াং ডাক তখন ঝিমিয়ে এসেছিল। নিমার কথায় সে আর উৎসাহ দিতে পারল না। কিন্তু নিমা তার যন্ত্রণা যেন নিজের দরদ দিয়ে অনুভব করল। মত ফিরিয়ে সেইখানেই চাকরদের খুর খাটাবার নির্দেশ দিল। আমাকে অনুরোধ করল তাকে সাহায্য কবার জন্য।

লামা বললেন: মেয়েটা একটু বিচলিত হয়ে পড়েছে। এমন বিচলিত হতে আমি তাকে দেখি নি। সমস্ত ব্যাপারে তাকে সাহায্য কবতে পারি, এমন শক্তি কি আমার আছে!

আমি কিছু করতে পারি না?

তোমাকে নিয়েই তার ভাবনা বেশি।

এমন উত্তর পাব আশা করি নি। জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

চিন্তিতভাবে লামা বললেন: সত্যিই তাই। এখানে তার বড় স্বামী আছে। ছেরিং পেনছোকেও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু নিমা ভাবছে তার শারীরিক পরিবর্তনের কথা। এ পরিবর্তন এমন

আকস্মিক আর বিস্ময়কর যে তার স্বামী একে কী ভাবে নেবে সে ভেবে পাচ্ছে না। তোমাকে এর উপলক্ষ্য মনে করে হয়তো সাংঘাতিক কিছু একটা করেও বসতে পারে।

কিন্তু ভগবান জানেন—

বাধা দিয়ে লামা বললেন : সত্যি কথা। ভগবান যা জানেন, মানুষ তা জানে না। সেইখানেই হল বিপদ।

হঠাৎ একটা উপায় এল মাথায়। বললুম : ঠিক হয়েছে, আজ রাতেই আমি একটা আশ্রয় খুঁজে নিচ্ছি।

লামা খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপর প্রস্তাব পেশ করলেন নিমার কাছে। নিমা কী উত্তর দিল বুঝলুম না। কিন্তু তার চোখ দুটো কি হঠাৎ ছলছল করে উঠল! লামা বললেন : নিমা বলছে, তা হয় না। তোমার পায়ের ঘা এখনও শুকোয় নি। স্বামীর বিরাগভাজন হবার ভয়ে অতিথির অপমান সে করতে পারবে না।

কড়া আফিমের মতো নেশার ঘোরে বুদ্ধি আমার আচ্ছন্ন হয়ে এল। এ কথার জবাব দিতে পারলুম না। মনে হল, মৌন থেকেই আমার জবাব দিতে পারলুম নিমাকে।

খটখট শব্দে তখন আমাদের তাঁবু খাটানো শুরু হয়েছে! ওয়াং ডাক ইয়াকের পিঠ থেকে নেমেই শুয়ে পড়ল। তার বন্দুকের খোঁচা-লাগা ক্ষতটায় ব্যথা হচ্ছে! ঢিলেঢালা ছুব্বার নিচে রক্তক্ষরণ হয়েছে কিনা দেখা গেল না।

তাঁবু খাটানো হলে তাকে ধরাধরি করে ভিতরে নিয়ে যেতে হল। আমারও সমস্ত দেহ ঘিরে ক্লান্তি নেমেছে। আমিও তার পাশে বসে পড়লুম। নিমা আমাদের খাবার ব্যবস্থা করতে গেল।

লামা বললেন : তোমরা তা হলে অপেক্ষা কর, আমি নিমার স্বামীদের খোঁজ করে আসি।

একটু হতাশার স্বরে যোগ করলেন : দুতিন শো তাঁবু পড়েছে

আর পাঁচ-সাত শো লোক এই অন্ধকারের ভেতর ছুটোছুটি করছে খুঁজে পাব কি কাউকে ?

নিমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল বাহিরে। লামা চেঁচিয়ে তার উত্তর দিলেন। বললেন: নিমা বলছে সুজাটা খেয়ে বেরবার জন্য। অন্ধকার তো হয়েই গেছে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আর লাভ কী!

লামার ফিরতে অনেক রাত হল। আমরা অধীরভাবে তাঁর অপেক্ষা করছিলুম। নিমার সঙ্গে ওয়াং ডাকের অল্প অল্প কথা হচ্ছিল। আমি শ্রোতা নই, দর্শক। না পারি তাদের কথা বুঝতে, না পারি নিজের কথা বোঝাতে। তাই তাদের কথাবার্তা বলার ধরন দেখেই একরকম তৃপ্তি পাচ্ছিলুম। ওয়াং ডাক লোকটা যেন আমাদের পরিবার ভুক্ত হয়ে গেছে। সে যে এত রাত পর্যন্ত কথাবার্তা বলতে পারছে তাই দেখেই আনন্দ হচ্ছিল।

লামা নিমার স্বামীকে খুঁজে পান নি। তবে সুনু আঙমার বাপের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সে ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়ে তাঁর তাঁবুর বাইরে বসেছিলেন। অন্ধকাবে লামা ঠিক ঠাহর করতে পারেন নি, নিমার চাকবেবা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছিল। ভদ্রলোকের সর্বস্ব গেছে। যা-কিছু সঙ্গে এনেছিলেন—লাসার মতো নক্‌শা করা গালিচা লুএর লোম আর চামড়ার জামা—তা বিক্রী প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কেনবার সবই ছিল বাকী। সেই ছোকরা লামা রাতাবাতি সব চুরি করে পালিয়েছে। এমন কি সুনু আঙমার গয়না পর্যন্ত নিয়ে গেছে।

অন্ধকারে প্রদীপের স্বল্প আলোতেও দেখলুম, ওয়াং ডাকের দু চোখ কৌতুকে চকচক করছে। কৌতুকটুকু প্রকাশ করার ভাষা হয়তো খুঁজে পাচ্ছে না।

ভদ্রলোক আর কী বললেন ?

লামা বললেন: আজ সন্ধ্যেবেলাতেই এ সংবাদ তিনি আবিষ্কার করেছেন। সকালবেলায় লামাকে দেখতে না পেয়ে ভেবেছিলেন,

হয়তো কাছেই কোথাও গেছে। এ বেলা কী একটা কেনবার জন্যে টাকা বার করতে গিয়ে দেখেন যে সর্বস্ব গেছে। ভদ্রলোক কাঁদতে পারলেন না, পারলে মনটা অনেক হালকা হত। বললেন, এমন যে হবে, তার আভাস তিনি আগেই পেয়েছিলেন। মাত্র দু মাস এদিকে বেচাকেনা হয়। তার সবটুকু সময় কাটল রাস্তায় মেয়েটার খামখেয়ালিপনায়। গ্যানিমায় দুটো দিনও তিনি পান নি। মেয়েটা কিছুতেই থাকতে রাজী হল না। জলের দরে আদ্ধেক জিনিস বেচে দিতে হল। এখানেও বাজার প্রায় ভেঙে এসেছে। দামের চেষ্টা করলে জিনিস ফেরত নিয়ে যেতে হত। ভাবলেন কেনার কাজ পরে করবেন, আগে জিনিসগুলো যাক। কী কুক্ষণে এমন মতি হয়েছিল!

ভদ্রলোক কী করবেন এখন?

তাঁর ফেরার ব্যবস্থা একরকম হয়ে যাবে। দরকার হলে দুচারটে ব্রি বেচে দেবেন। দুধ দিচ্ছে এমন চমরী গাইএর দাম এদিকে আছে। আফসোস হচ্ছে এই ভেবে যে তাঁর সারা বছরের রোজগারটা মাটি হয়ে গেল।

একটু থেমে বললেন: ভদ্রলোক ভাবছেন, কাল ধারের চেষ্টা করবেন কিনা। তাঁর প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু ভারতীয়েরা তাদের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে বলছেন। অনেকে এমনই ধারে জিনিস নিয়ে গেছে, পরের বছর আর আসে নি এ মণ্ডিতে। গেছে পুরাংএ কিংবা মাব্‌চা খান্‌বাবের মণ্ডিতে। এই প্রতারণায় ভারতীয়দের ক্ষতি করেছে যত, তিব্বতীদের অসুবিধা হয়েছে তার চেয়ে বেশি। কারও কাছে ধার চাইতে এখন তাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়।

আমি ভাবছিলুম সেই ছোকরা লামার কথা। প্রশ্ন করলুম: এসব অন্যায়ের কি কোন প্রতিকার নেই?

এই প্রতারণার?

এই গুণ্ডাবৃত্তির। লামা সেজে এমন সাংঘাতিক অন্যায় করে যাবে, আর দেশের লোক তা মাথা পেতে মেনে নেবে?

লামা বললেন : না মেনে উপায় নেই বলেই সুস্থ আওমার বাবা এমন মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। তা না হলে এমন শক্ত কর্মী পুরুষ আমি কম দেখেছি। কোন ভয়েই তিনি এমন অন্যায়কে মেনে নিতে পারতেন না।

লামা থামলেন না, বললেন : জান তো, এ দেশ লামা-শাসিত। লামার নামে নালিশ করবার আদালত এ দেশে নেই। তবে গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করে লামারাও নিষ্কৃতি পান না, সে গল্প শুনেছি। স্তোঙচেন দোরজেচেনের মতো পণ্ডিত ও উঁচু দরের লামাকেও প্রাণদণ্ড নিতে হয়েছিল তোমাদের শরৎ দাসকে তিব্বতী ভাষা শেখাবার জন্যে। এমন নিষ্ঠুরতার গল্প তিব্বতের ইতিহাসে বোধহয় আর নেই

এ গল্প আমিও শুনেছি। ইংরেজের চর হয়ে নাকি রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতে ঢুকেছিলেন চোরের মতো। যে লোক তাঁকে নিজের বাড়িতে থাকতে দিয়েছিল, আর যে লোক তাঁকে ছাড়পত্র দিয়েছিল, তাদের দুজনকেও এই লামার সঙ্গে কারারুদ্ধ করা হয়। বিচারে এই লামার মৃত্যুদণ্ড হল। পাথর বেঁধে ব্রহ্মপুত্রের জলে ডুবিয়ে তাঁকে মারা হয়। লোকে বলে, এর ভিতর লামাদেরও চক্রান্ত ছিল।

কে এই মৃত্যুদণ্ড দিল ?

তালে লামার গভর্মেণ্ট।

তালে লামাকে ইংরেজীতে বলে দলাই লামা। বৌদ্ধধর্মের প্রধান গুরু হয়ে তিনি একজন ধর্মগুরুর মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিলেন? ধর্মে বাধল না এতটুকু ?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল লামার। বললেন : কৌতুক তো এইখানেই। ধর্মগুরু যদি রাজ্যশাসন করেন তো এক জায়গায় ভুল করতেই হবে। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির বিবাদ তো চিরকালের।

কৌতূহলী মন আমার। জিজ্ঞাসা করলুম : তালে লামার গভর্মেণ্ট কি শুধু লামাদের নিয়েই ?

লামা বললেন : তা কেন হবে ? সমস্ত সভ্যদেশের পার্লামেণ্টের

মতো তাদেরও দুটো সভা আছে। ছে ডুঙে এক শো পঁয়ষট্টি জন উঁচুদরের লামা, আর ঠিক অতগুলোই সাধারণ লোক ড়ুং খোএ। লামাদের নেতা চারজন। ট্রুং ইক ছেন মো। এঁদেরই একজন পার্টির লীডার। তেমনই সাধারণ লোকদের নেতা চারজন শাব পে। সিনিয়র ভদ্রলোক পার্টির লীডার। কাসা বা ক্যাবিনেট এদের ছোট নয়। প্রধানমন্ত্রী চারজন, তিনজন অর্থমন্ত্রী, দুজন যুদ্ধমন্ত্রী। আর স্বরাষ্ট্র, ধর্ম আর বিচার বিভাগের জন্যে একজন করে মন্ত্রী। চারজন ট্রুং ইক ছেন মোও এই ক্যাবিনেটে আছেন।

চারজন প্রধান মন্ত্রী শুনে আমি আশ্চর্য হলুম। প্রধান তো একজনই হবে। লামা বললেন: প্রধান একজনই। তিনজন তাঁর সহকারী। কিন্তু চারজনেরই নাম প্রধানমন্ত্রী।

মৃদু মৃদু হেসে লামা বললেন: এত সব থেকেও কোন ক্ষমতা নেই দেশের লোকের। গভর্মেণ্ট তো রাজ্যশাসন করে না, করে গোটা চারেক মঠ। নেচুং, সেরা, ডেপুং ও গ্যানডেন। তার ভেতর প্রধান হল নেচুং। ভবিষ্যৎ বাণী করবার জন্যে তাদের লামা আছে। সেই লামাদের ওপর দেবতার ভর হয়। জাঁকজমকওয়ালা পোশাক পরে একজন লামা বসেন আর দশজন পরিবৃত হয়ে। কাড়া-নাকাড়া আর করতাল বাজে জোরে জোরে। তারপর দেবতার ভর হলেই সেই লামা সকল প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেন, সকল সমস্যার সমাধান করে দেন, সকল অপরাধের শাস্তির বিধান দেন। এমন কি কাসার সদস্যদেরও শাস্তির বিধান দেন এঁরা। তালে লামা তাঁর ক্যাবিনেট পরিবৃত হয়ে এই বিধান নিতে আসেন।

এমন অদ্ভুত গল্প আমি শুনি নি।

লামা আমার কৌতূহল লক্ষ্য করে বললেন: এ দেশে এই বিচিত্র উপায়ে দেবতার নির্দেশ নেবার রীতি প্রচলিত হয়েছে প্রায় পাঁচ শো বছর আগে টাশি লুনপো মঠের লামা গেনডুন ডুবের আমলে। আমার বিশ্বাস প্রাচীন গ্রীস থেকে এই বিশ্বাস ছড়িয়েছে। এই লামা

মরবার আগে তাঁর শিষ্যদের বলে গিয়েছিলেন, কোথায় তিনি পুনরায় জন্ম নেবেন। ঠিক সেইখানে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে নির্ধারিত দিনে একটি ছেলে জন্মেছে আর প্রথম কথা বলতে শিখেই টাশি লুন্‌পো মঠে ফিরে যাবার ইচ্ছে জানিয়েছে। এই বালকই পেনছেন লামা গেনডুন গিয়াছো।

তালে লামা খোঁজবার রীতি আজও কতকটা এই রকম। লাসার চারটি মঠের লামারা চারটি বালকের নাম-ঠিকানা দেন। দেবতা কোনও লামার উপর ভর করে এই সংবাদ দেন। গভর্মেণ্ট তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন ও তাদের পাঁচ বছর বয়সে ব্যালট করে একজনকে তালে লামা করেন। বিদেশী লেখকরা বলেন, এতে নোঙরামি ঢুকেছে। ছেলের বাপেরা তালে লামার বাপ হবার জন্য অসৎ উপায়ের শরণ নিয়ে থাকেন।

বললুম: এ তো লাসার কথা, কিন্তু লাসাই তো সমস্ত তিব্বত নয়। তিব্বতের লোক তাদের অনুযোগ জানাবে কার কাছে?

লামা বললেন: এ তোমার কঠিন প্রশ্ন। পুরাণে এক জুম্পান-ওয়ালার কথা শুনেছি, তাঁর নাম জুম্পান পুসো। তিনি রাজপুরুষ, প্রদেশপাল নামে তাঁর খ্যাতি। লাসায় শুনেছি, বিশিষ্ট কাজের জন্যে অনেক রাজপুরুষ জায়গীর উপহার পান। সেই প্রদেশের প্রজাদের একচ্ছত্র মালিক হন তাঁরা। শুধু নিয়মিত কর আদায় করা নয়, প্রয়োজনমতো প্রাণটাও তাঁরা নিতে পারেন। এই প্রদেশটা কোন্ জুম্পানওয়ালার, আমার তা জানা নেই। শুধু এইটুকু জানা আছে যে প্রতিবাদ জানাবার প্রয়োজন নেই যাঁর দরবারে, তাঁর কাছে এ অন্যায়ের খবর আমাদের আগেই পৌঁছেছে। বুদ্ধ তাকে সুবুদ্ধি দেবেন।

বলে গভীর বিশ্বাসে বৃদ্ধ লামা মাথা নত করলেন।

চোদ্দ

সকালবেলা আমরা নিমার স্বামীদের খুঁজতে বেরলুম। ঊষার আলো তখন সবে ফুটে উঠছে পূর্বাকাশে। নিমা আমাদের জাগিয়ে দিয়েছিল। ঘুমের চোখে তার নিদ্রালস মুখখানি দেখেছিলুম, রাত জাগার ক্লান্তি জড়িয়ে ছিল তার দু চোখের পাতায়।

লামা বললেন: কাল রাতে তুমি ঘুমিয়ে পড়ার পর নিমা এসেছিল আমার কাছে। আমি যা বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, সে তা জিজ্ঞেস করতে ভুলল না। জানতে এসেছিল সুন্নু আঙমার বাপ তার স্বামীদের কোন খোঁজ রাখেন কিনা। এরা তো এক জায়গার লোক নয়। কেউ কাউকে চিনত না। আমার জন্যেই যেটুকু পরিচয়। সুন্নু আঙমার পেটের ব্যথার চিকিৎসা করি আমি, আর আশ্রয় পেয়েছি নিমার তাঁবুতে। তার সেজ স্বামীটা পালিয়ে নিমার আঁচলের তলায় ঘুরঘুর করত বলেই সুন্নু আঙমাকে চিনেছিল, আর চিনেছিল তার বাপকে। সুন্নু আঙমারাও চিনেছে তাকে। কাজেই নিমা যে ছেরিং পেনছোর কথাই জিজ্ঞেস করছে, তা বুঝতে পারলুম। আর সত্যিই, সে ছোকরার খবরও আমি পেয়েছিলুম। তোমার সঙ্গে রাজনীতির আলোচনা করতে গিয়েই তো ভুল হয়েছিল আমার। এইজন্যেই শাস্ত্রে বলে, রাজনীতি থেকে দূরে থাকবে।

বলে হাসতে লাগলেন লামা।

আমি উৎসুক হয়ে বললুম: কী খবর পেলেন তার?

লামা বললেন: নতুন কিছু নয়। আমরা জানি আর যা অনুমান করিতে পারি, তাই। সেই ছোকরা লামার খোঁজে এসেছিল এদের তাঁবুতে। কিন্তু সে তো সকাল থেকেই ফেরার। সারাদিন তন্ন তন্ন করে খুঁজে বিকেলের দিকে এসে যখন শুনল যে, সুন্নু আঙমার বাপের

সর্বস্ব চুরি করে লোকটা পালিয়েছে, সে আর কারও অপেক্ষা করল না। সন্ধ্যের আগেই ঘোড়া ছুটিয়ে গেছে রেতাপুরীর দিকে। সে ভাবছে, অত বড় শঠকে আশ্রয় দিতে পারে এমন মঠ শুধু রেতাপুরীতেই আছে।

শুমু আঙমার বাবা তাদের তাঁবুর খবর দিতে পারলেন না?

লামা বললেন: কে কার কড়ি ধারে এখানে? আমরাই কি পেরেছিলুম কাল রাতে এদের খুঁজে বার করতে? চেষ্টার তো ত্রুটি করি নি। অজানা অচেনা লোকের তাঁবুর ভেতর মাথা গলাতে পারি না, তাতে মার খাবারও ভয়, আর সময়েরও অভাব। না হোক করেও দুশো তাঁবু এই মাঠে পড়েছে।

আমি চিন্তিত হলুম।

লামা বললেন: আশা করা যায় দিনের বেলায় তারা তাঁবুর ভেতর বসে থাকবে না। তাদের চাকরেরা অন্ততঃ বাইরে থাকবে।

ঠিক কথা। খানিকটা আশ্বস্ত হওয়া চলে।

তাঁবুগুলিকে আজ আর বকের পাখার মতো দেখাচ্ছে না। খুঁটোর সঙ্গে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা সাদা কাপড়ের দু চালা ঘরের মতো। আরও এক রকমের ঘর দেখলুম, সেগুলোর আধখানা পাকা আর আধখানা নড়বড়ে। পাথর আর মাটির দেওয়াল। মাঝখানে একটা বাঁশের উপর থেকে দুদিকে ত্রিপলের চাল নেমেছে। শুনতে পাওয়া গেল, ব্যবসা শেষ করে দেশে যাবার সময় এরা এর দরজা পর্যন্ত অস্থাবর সম্পত্তিগুলি পাকা গুদামজাত করে যায়।

বেশীক্ষণ খুঁজতে হল না। উত্তরে জায়গা না পেয়ে দক্ষিণে এরা ছাউনি ফেলেছিলে। আমাদের তাঁবু থেকে দূরত্ব নিতান্তই উপেক্ষণীয়। চাকরেরা অলসভাবে চা খাচ্ছিল। এ দেশে তারা পয়সার জন্য চাকরি করে না, করে পিতার প্রতিশ্রুতি রাখবার জন্য। এদের পিতা হয়তো কোন দুঃসময়ে দশ ইয়েন ধার নিয়েছিল। শোধ করবার সঙ্গতি এদের বড় একটা থাকে না। তাই ছেলেমেয়ের বছর দশেক বয়স

হতেই গতরে খাটবার জন্য পাঠিয়ে দেয়। ধারের শর্ত অনুসারে দশ-পনের বছর চাকরি করবে। এও পুরুষানুক্রমের ব্যাপার। ইতিমধ্যে উত্তমর্ণ মরে গিয়ে থাকলে তার ছেলের চাকরি করে দিয়ে আসবে। তারপর দীর্ঘদিন চাকরির পর ফিরে যাবারও ইচ্ছে থাকে না। স্বাধীনভাবে রুজি-রোজগারের সুযোগও খুব অল্প থাকে। তাই অনেকেই আর ফিরে যায় না। দুটো খেতে পরতে পারছে, এতেই সন্তুষ্ট থাকে।

লামা বললেন: এ দেশে তাই চাকর এত বেশি। অবস্থাপন্ন লোকের ঘরে অনেকগুলো চাকর থাকবে, এটা খুব সাধারণ ঘটনায় দাঁড়িয়ে গেছে।

চাকরদের কাছে নিমার স্বামীদের যা খবর পাওয়া গেল, তাকে সংবাদ না বলে দুঃসংবাদ বলা উচিত। ছোট ভাই রেতাপুরীর দিকে গেছে শুনে বড় ভাই সারারাত ছটফট করেছে। সেই ছোকরা লামার দুষ্কৃতির কথা আরও অনেকে শুনেছে। সম্পূর্ণ ঘটনা না জানলেও এটুকু জেনেছে যে সেই পলাতক লামার পিছনে গেছে তার ছোট ভাই। কিছু একটা দুর্ঘটনা বাধাবে, এই ভয়ে বড় ভাইও শেষ রাতে ঘোড়া ছুটিয়ে গেছে। জানা গেল, ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের প্রায় শেষ হয়েই এসেছিল। তারা অপেক্ষা করছিল নিমার জন্য। চাকরদের উপর যে সব নির্দেশ দিয়ে গেছে, তাতে মনে হয় দু দিনেই এরা সব গুটিয়ে তুলতে পারবে। বিশেষ করে কর্ত্রী যখন এসেই গেছে।

নিমা সুখী হল না। কিন্তু কী একটা ভেবে আশ্বস্ত হল দেখলুম।

চাকররাও বড় নিশ্চিন্ত হয়েছে বোঝা গেল। কী করতে কী করে রাখত, তখন লাঞ্ছনার সীমা থাকত না তাদের। তৎপরভাবে নিমার হাতে সমস্ত কাজের ভার বুঝিয়ে দিয়ে বাটির চা শেষ করতে বসল।

নিমা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করল। লামা বললেন: অনেক প্রয়োজনীয় কথা জেনে নিচ্ছে। যাবার সময়

তার স্বামী কী বলে গেছে, এখানেই আবার ফিরবে, না কৈলাসের পথে এগিয়ে যাবে ; এরা তার জন্যে অপেক্ষা করবে, না বাণিজ্য শেষ হলে ছাউনি তুলে রওনা হয়ে যাবে।

এসব কথার ঠিক উত্তর তারা দিতে পারল না। মালিকও তখন প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, আর তারাও এত সব চিন্তা করতে পারে নি।

নিমা বলল : ভাইদের ইনি খুব ভালবাসেন। বাপ মারা যাবার পর নিজের ছেলের মতো মানুষ করেছেন কিনা!

আমি ভেবেছিলুম, তার দশ বছরের স্বামীটিও বোধ হয় বড় ভাইএর সঙ্গেই গেছে। কিন্তু নিমা তা ভাবে নি। বলল : ছোট ভাইটা বোধ হয় এখন ঘুমচ্ছে, খুব ঘুম ছেলেটার!

বলে তাঁবুর ভিতরে চলে গেল। অল্পক্ষণেই মনে হল, সমস্ত গ্যাকার্কোর মণ্ডি বুঝি আনন্দে হঠাৎ জেগে উঠল। তাঁবুর ভিতরে মাথা গলিয়ে দেখি, সেই ছেলেটা নিমাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে লাফাচ্ছে আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। এ কী বন্যউল্লাস! জগতের প্রথম শিশুও বোধ হয় তার মাকে এমনই করে অভিনন্দন জানাত। আদিম হলেও অসভ্য মনে হল না। উন্মত্ত হলেও আনন্দ পেলুম মনে মনে।

একটুখানি খোঁচা ছিল এই দৃশ্যের ভিতর। সেটা সভ্য মানুষের বিবেকের খোঁচা। আজকের এই বালকটি নিমাকে জননীর মতো নিশ্চিন্ত অবলম্বন পেয়ে এত বড়টি হয়েছে। আর কয়েকটা বছর পরে সে তা বেমালুম ভুলে যাবে—যেমন ভুলতে চাইছে তার সেজ স্বামী। তখন সে স্বামীত্বের দাবী জানাবে আজকের এই স্নেহশীলা নারীর উপর। সন্তান গর্ভে ধারণ করে নারী জননী হয়, মা হয় না। মায়ের দায়িত্ব অনেক বড়। সন্তান পেটে না ধরেও নারী মা হতে পারে। সমাজের নিয়মে নিমা এই বালকের স্ত্রী হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে সে তার মা। বড় হয়ে এই বালক তার মায়ের অবমাননা করবে সুস্থ মনে। তার আগে কি নিমা মরতে পারবে না?

অনেকক্ষণ পরে তারা শান্ত হল। আমার মন কিন্তু শান্ত হল না। ইচ্ছে হল, আত্মহত্যার মন্ত্র দিয়ে যাই নিমার কানে কানে।

লামা বললেন: চল, নিমা তার ঘর-সংসার বুঝে নিক, আমরা একটু ঘুরে আসি।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। এখানে বসে থেকে করবই বা কী, তার চেয়ে ঘুরেফিরে দেখাই যাক বাজারটা। লামার অনুসরণ করে আমি বেরিয়ে এলুম।

খানিকটা পথ এগিয়ে লামা বললেন: সুন্নু আঙমার বাবাকে একবার দেখে আসি। সে ভদ্রলোক খুব মুষড়ে পড়েছেন।

সুন্নু আঙমা কী বলে?

তার বাবা বলছিলেন, যে মেয়েটার স্বপ্ন নাকি এখনও ভাঙে নি। তার বিশ্বাস, সুস্থ মনে লামা এ কাজ করে নি। বাজারে নাকি কারা তাকে ছাং খাইয়ে দিয়েছিল। টলতে টলতে তাঁবুতে যখন ফিরে এল, তখন তার জবাফুলের মতো চোখ। নেশা ভেঙে গেলে সে নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসবে। তার বাপ বললেন, লোকটা চুরি করল কখন? রাতে যখন তারা ঘুমুচ্ছিল, না—

না?

সুন্নু আঙমার বাবা তাঁর সন্দেহের কথাটা ভাঙেন নি। মনে হল, ওই মেয়েটাই হয়তো এ কাজে তাকে সাহায্য করেছে।

সে কখনও হতে পারে?

আমি বিস্মিত হলুম। কিছু বিচিত্র নয়। লোকটা যেমন ঘুঘু, হয়তো একটা মস্ত রকমের ধাপ্পা দিয়ে গেছে। বাপের ভয়ে মেয়ে সে কথা ভাঙতে সাহস পাচ্ছে না।

কোন কাজ আছে কি তাঁর সঙ্গে?

লামা বললেন: বিদেশে ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন। অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে না পারি, সান্ত্বনা তো দিতে পারব। সেটুকুই

বা কে দিচ্ছে ? আর তা ছাড়া তিনি হয়তো কোন ভারতীয় বণিকের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারবেন।

সে কথা সত্যি। দেশে ফিরতে হলে এখানেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমারও একটা দেশ আছে। নিতান্ত আপনার জন না থাকলেও আত্মীয় বন্ধু সেখানে আছেন। ফিরে না গেলে অশ্রু-বিসর্জন করে কেউ নিদ্রাহীন রাত কাটাবেন না, কিন্তু চিন্তা করবেন, নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করবেন, হয়তো দুঃখও পাবেন অনেকে। তবু তাঁরা আত্মীয় বন্ধু, তবু তাঁরা নিজের দেশের লোক। সেই আমার স্বর্গ।

পরমুহূর্তেই ভাবলুম অন্য কথা। যদি একবার সেই তুষারমণ্ডিত কৈলাস-শিখর দেখতে পেতুম, আর হেমাম্ভোজ প্রসবি সলিল· মানসস্য।

সুন্নু আঙমাদের তাঁবুতে পৌছে দেখলুম, তার বাবা তখন তাঁবুতে আছেন। আর একটা কোণে বসে একজন বৃদ্ধ লামা আপন মনে কী-সব ঝাড়ফুঁক ও মন্ত্র পাঠ করছেন। অন্য পাশ থেকে সুন্নু আঙমা তার কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে এই সব পূজার্চনা লক্ষ্য করছে।

সুন্নু আঙমার বাবা উঠে দাঁড়িয়ে কোমর পর্যন্ত নত হয়ে জিভ বার করে লামাকে অভিনন্দন জানালেন। আমারা মাটিতে বিছানো কম্বলের উপর বসলুম। লামার কানের কাছে মুখ এনে সুন্নু আঙমার বাবা যা বললেন, সে কথা লামাও আমাকে শোনালেন তেমনই সাবধানে। হৃত ধন পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় এঁকে আনা হয়েছে। কখন্ কী ভাবে চুরি হয়েছে, এবং চোরাই মাল ফিরে পাওয়া সম্ভব কি না, এই লামা তা গুনে বলে দেবেন। এ তল্লাটে তাঁর হাতযশ আছে, এবং যে ভদ্রলোক এঁকে নিয়ে এসেছেন, তিনিও সুন্নু আঙমার বাবার পাশে বসে দীপ্ত দৃষ্টিতে গৌরব বিকীর্ণ করছেন।

পূজা-পাঠ শেষ হতেই চা এল। ভক্ত লামা দেবতাকে নিবেদন না করে কোন কিছু পানাহার করেন না। চায়ের বাটি হাতে নিয়ে

বিড়বিড় করে যে মন্ত্র পাঠ করলেন, তা বাংলারই মতো। মন্ত্রটা মনে রয়ে গেল।

ওঁ গুরু বজ্রনৈবেদ্য অঃ হুং।

ওঁ সর্ববুদ্ধ বোধিসত্ত্ব বজ্রনৈবেদ্য অঃ হুং।

ওঁ দেব ডাকিনী শ্রীধর্মপাল সপরিবার বজ্রনৈবেদ্য অঃ হুং।

আমাদের লামার মুখে মন্ত্র কখনও শুনি না। শুনি বুদ্ধের নামকীর্তন করতে, বুদ্ধের নাম করে সান্ত্বনা বিতরণ করতে। চায়ের বাটি হাতে নিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। মন্ত্র পাঠ করে নতুন লামা চায়ে চুমুক দেবার পর আমাদের লামা পান শুরু করলেন।

সুন্নু আঙমার বাবা একটু উসখুস করছিলেন। তাঁর পাশের ভদ্রলোক ইঙ্গিতে বোধ হয় তাঁকে একটু ধৈর্য ধরতে বললেন।

চায়ের বাটি নিঃশেষ করে লামা সকলের কৌতূহল নিবসন করলেন। যা বললেন, তার অর্থ শুনলুম আমাদের লামার মুখে। বললেন, কাল সকালের দিকে চুরি হয়েছে। বাইরের লোক কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল, সেই চুরি করছে। সে লোক দক্ষিণে গেছে, আর এদিকে ফিরবে না। কাজেই চোরাই মাল পাবার আর কোন আশা নেই।

আমি সুন্নু আঙমার দিকে চেয়েছিলুম। লক্ষ্য করলুম, একমুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল তার মুখ। শরীরের শিরা-উপশিরা দিয়ে তার রক্ত চলাচল যেন হঠাৎ থেমে গেল। তার দুঃখের উৎস আমার অজানা নেই। সেই ছোকরা লামা তাকে প্রতারণা করে গেল, শেষে এই কথাই কি বিশ্বাস করতে হবে?

সুন্নু আঙনার বাবা আরও মুষড়ে পড়লেন। পাশের আসনে উপবিষ্ট তাঁর বন্ধুটি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন মনে হল। নতুন লামা তখন তাঁর হাতের মণিচক্র ঘুরিয়ে জপ শুরু করছেন। শুনেছি, ওই কৌটোর ভিতরে আছে একখানা তুলট কাগজ, তাতে লক্ষ বার লেখা আছে ওঁ মণিপদ্মে হুঁ মন্ত্র। এঁরা বলেন, মণি পেমে হুম্।

মণিচক্র একবার ঘোরালে লক্ষ জপের ফল হয়, এই রকম এঁদের বিশ্বাস।

সঙ্গী ভদ্রলোক বোধহয় কিছু খাদ্য আনবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যবের ছাতু চাম্পা আর জোয়ারের মদ ছাং এল চাকরদের হাতে। ছাং বড় চমৎকার মদ। অল্পেই নেশা হয় বলে এর এত আদর। নতুন লামা কী একটা মন্ত্র পাঠ করে এক নিঃশ্বাসে তাঁর বাটিটা নিঃশেষ করে আবার খানিকটা চেয়ে নিলেন ছাতু দিয়ে খাবার জন্য।

আমাদের লামা তখন তাঁর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। অনেক তথ্য সংগ্রহ করে বললেন ঃ মদ খাওয়া নিষিদ্ধ নয় লামাদের। বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নকে স্মরণ করে মদের বাটিতে বুদ্ধের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে আকণ্ঠ মদ খেতে পার। ওঁ অবোরা নে ইর রে হুম্ মন্ত্র সাত বার জপ করে পশু বলিতেও দোষ নেই। কিন্তু কী মন্ত্রে শুদ্ধ করে সেই বলির মাংস খেতে পার, তা এঁর জানা নেই বলছেন।

তাঁর বলার ধরনেই বুঝলুম যে আমাদের লামা মনে মনে অসম্ভব চটেছেন। দীর্ঘদিনের সাধনায় যে সংযম অভ্যাস করেছেন, আজ তার পরীক্ষা দেবার সময় দেখলুম বেশ অনায়াসে তাতে তিনি উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। আমাকে বললেন ঃ চল, এইবার আমরা উঠি। এই বেলায় ভারতীয়দের ধরতে না পারলে অসুবিধা হবে। দুপুরে তেমন উৎসাহ পাওয়া যায় না।

সুস্থ আঙমার বাবার কাছে বিদায় নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলুম। নতুন লামা বক্র দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে লাগলেন।

খোলা আকাশের নিচে এসে মনভরা বিরক্তি প্রকাশ করতে তাঁর একটুও দেরি হল না। বললেন ঃ এরা সবাই এক। এমন জানলে আসতুম না এখানে। নিতান্ত ওই নির্বোধ মেয়েটার জন্যেই ভাবনা। টাকাকড়ি সব গেছে, এবারে মেয়েটা না যায় ভদ্রলোকের।

তাঁর পায়ের নিচে দুপদাপ করে শব্দ উঠল! দেখতে পেলুম, বৃদ্ধ আজ জোরে জোরে মাটিতে পা ফেলছেন।

পনর

বুকের ব্যথায় ওয়াং ডাক আজ উঠতে পারে নি। তার সেই চাকরটাই ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। আমাদের দেখতে পেয়ে জিভ বার করে নমস্কার করল, কিন্তু দাঁড়াল না। ছুটে গিয়ে একটা দোকানের ভিতর ঢুকে পড়ল। আমরা তাকে অনুসরণ করে সেই দোকানটায় ঢুকতে গিয়ে দেখি, ব্যস্তভাবে সে তখুনি বেরিয়ে আসছে। গড়গড় করে কী বলে এল দোকানীকে, লামাও তা বুঝতে পারলেন না।

ওয়াং ডাকের চাকর যখন ঢুকেছে, তখন নিশ্চয়ই সেটা ভারতীয়ের দোকান। এইটুকু অনুমান করেই লামা আমাকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন।

ঢুকে দেখি, দোকানটা ভারতীয়েরই বটে। আমাদের দেশের পাহাড়ীজাতের। চোঙার মত সরু পাতলুনের উপর গলাবন্ধ কোট। মাথায় হালকা টুপি শুধু চাঁদিটুকুর উপর আলগোছে বসানো।

জুলু জুলু বলে আপ্যায়িত করলেন আমাদের। মাঝখানের প্রশস্ত ফরাশে আসন করে দিলেন। সমস্ত ঘর জুড়ে ফরাশ। আমরা তারই উপর বসে পড়লুম। পাশে একটা বস্তার ভিতর শুকনো খেজুর কিছু অবশিষ্ট ছিল। দুখানা রেকাবিতে করে তারই গোটাকয়েক এগিয়ে দিলেন।

আমি চারদিকে চেয়ে দেখলুম। দেওয়ালের ধারে ধারে তার পণ্য সাজান আছে। মনোহারী দোকান এঁর। নানা রঙের পাথর আর মালা। সুতোর আর সাটিনের কাপড়। খাবার জিনিস ছাড়া বোধ হয় আর সবই আছে। এক পাশে দরমার উপর কম্বল বিছান আছে, আর একটা বাল্লিশ। বোধ হয় রাত্রির নিদ্রার ব্যবস্থা এটা।

এ সমস্ত দেখে মুখখানা ফেরাতেই দোকানী কেমন যেন চমকে

উঠলেন মনে হল, বিহ্বলতা দেখলুম তাঁর দৃষ্টিতে। একটু সামলে নিয়ে হিন্দীতে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের হিন্দী নয়, প্রেমচাঁদের হিন্দুস্থানীও নয়, হিন্দী উর্দু আর পাহাড়ী মেশা এক অপূর্ব ভাষা। কিন্তু বুঝতে একটুও কষ্ট হল না।

সত্য পরিচয়ই দিলুম। দোকানীও তাঁর পরিচয় দিলেন। বললেন, উমেদ সিং তাঁর নাম। আসকোটের লোক তাঁরা, প্রতি বছর এখানে বাণিজ্য করতে আসেন।

আমিও আমার দুঃখের কাহিনী শোনালুম। উমেদ সিং অবাক হয়ে আমার গল্প শুনলেন। বললেন, ও পথে তাঁর যাতায়াত নেই। তবে শুনেছেন, সে বড় কষ্টের পথ। প্রতি বছর বরফ পড়ে সে পথ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর শীতের শেষে যখন রাস্তা খোলাবার প্রয়োজন হয়, বরফের উপর তখন একপাল চমরী গাইকে ছেড়ে দেয়। তাদের পিছনে চলে মানুষ—ঘোড়ায় আর পায়ে হেঁটে। অদ্ভুত ক্ষমতা এই চমরীগুলোর। নতুন আর পুরনো বরফ চেনে। পুরনো বরফের নিচে পুরনো রাস্তা যেন তারা স্পষ্ট দেখতে পায়। তাদের পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে মানুষ চলে, চলে অন্য জানোয়ার। এমন দুর্গম রাস্তায় কেউ পথ হারিয়ে ফেলবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

লামা আমাদের গল্প শুনতে লাগলেন, বোধ হয় অর্থ বোধ হল না একেবারে। তবু বসে রইলেন।

উমেদ সিং বললেন: আসকোটের লোকেরা এতটা দূরে আসতে চায় না। এতদূর না এসেও এসব কেনা-বেচা পথেই করা যেতে পারে। তারা পুরুষানুক্রমে আসছে, তাই আসে। তবে মালপত্র কিছু সুবিধা দরে এখানে পাওয়া যায়। গারথক থেকে এই মণ্ডিতেই অনেক বেশি মাল আসে। তারা বেচেও সুবিধা দরে। আসল কথা কিন্তু অন্য। এসে এসে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, তাই না এসে পারে না।

পাশের ছোট ঘর থেকে রান্নার শব্দ আসছিল। উমেদ সিং সেখানে মুখ বাড়িয়ে কী বলে এলেন। ফিরে এসে কতকগুলো

কাগজপত্রের ভিতর থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন। আমরা কেউই সিগারেট খাই না। আমার অনাসক্তি দেখে লামা আশ্চর্য হলেন। উমেদ সিং নিজে একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন : বড় বদ অভ্যেস ধরেছে আমাদের। ছেলেদের আবার সিগারেট না হলে চলে না।

জিজ্ঞাসা করলুম : তাদের তো দেখছি নে এখানে!

বড় কৌতুক বোধ করলেন উমেদ সিং। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে অনেক। টুপিব পাশ দিয়ে মাথার সাদা চুল তাঁর বয়সের পরিচয় দিচ্ছে। বললেন : বাবুরা পুবাঙের মণ্ডি পর্যন্ত যে আসে, এই আমার বাপের ভাগ্যি। মেজোটা তো দক্ষিণে হাঁটা শুরু করেছিল। কলেজে পড়ে ইংরেজ বাহাদুরের কালেক্টর হবে। বার কয়েক ফেল করে ফিরে এসেছে।

বলে হাসতে লাগলেন। তারপব একসময় গম্ভীর হয়ে ইংরেজের সুখ্যাতি করলেন। বললেন : সত্যি বলতে কী, ইংরেজ রাজের কল্যাণেই করে খাচ্ছি।

একটু স্মরণ করে গল্পটা শোনালেন। লর্ড কার্জন না কোন্ এক সাহেব হিন্দুস্থান থেকে লাসা দখলের জন্য যাত্রা করছিলেন। কয়েকটা জায়গা দখল করতেই তিব্বতীরা সন্ধি করল। এই সন্ধির জোরেই তো আমরা আজ বাণিজ্য করে খাচ্ছি। গারথকে আমাদের দেশী লোকের দোকান আছে। শুনেছি লাসার পথেও নাকি হিন্দুস্থানীরা ব্যবসা করছে গিয়াংসি আর ইয়াটুঙে। ধন্য রাজা ইংরেজ!

ইংরেজের প্রশংসায় আমার ভাবান্তর ঘটল না দেখে অন্য গল্প ফাঁদতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় সেই ছোট ঘর থেকে একজন বৃদ্ধা মহিলা তিন গেলাস চা আনলেন একটা থালায় করে। তাতে চুমুক দিয়ে দেখলুম, আমাদের দেশী চা। কেমন রোমাঞ্চ জাগল রক্তে।

চায়ের গেলাস হাতে নিয়ে বুড়োর গল্প আরও সরস হল। বললেন : এ মুলুক কিন্তু ইংরেজের ছিল না। তিব্বতীদের কাছ থেকে গিয়েছিল কাশ্মীররাজের হাতে। কাশ্মীর মহারাজের ডোগরা

সেনাপতি জরোয়ার সিংএর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। ১৮৩৪ সনে জরোয়ার সিং আসকার্দু কার্গিল লাদাক জয় করে লাসায় অভিযান করেন। কিন্তু এইখানে তীর্থপুরীর পথে চীনা সৈন্যের কাছে তাঁর পরাজয় ঘটল। জরোয়ার সিং হত হলেন বটে, কিন্তু কাশ্মীররাজ লাসার সঙ্গে সন্ধি করে নতুন রাজ্যের ওপর অধিকার রক্ষা করলেন। শোনা যায়, এখনও কাশ্মীররাজ লাসায় কর পাঠান। তার ভেতর আঠারোটি সাদা চামর।

আমাদের আলাপ আলোচনায় লামা উৎসাহ পাচ্ছিলেন না এতটুকু। চায়ের গেলাস শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। ইংরেজীতেই বললেন: পরিচয় তো হয়ে গেছে তোমার সঙ্গে, এবারে আমি উঠি।

তিব্বতী ভাষায় উমেদ সিংকেও বোধ হয় সেই কথাই বলে গেলেন।

পরে উমেদ সিংএর মুখে শুনলুম তিনি আমার হিন্দুস্থানে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দেবার অনুরোধ জানিয়ে গেছেন।

উমেদ সিং বললেন: এ আর এমন শক্ত কথা কী! ওদের দল ছেড়ে তুমি আমাদের কাছে এসে থাক। জোর একটা হপ্তা, তার ভেতরই আমরা দোকান গোটাব। তুমিও ফিররে আমাদের সঙ্গে।

ব্যবস্থাটা আশাপ্রদ। তবু নিজের অসহায়তার কথা জানালুম। শরীর সমর্থ হয়ে উঠলেও অর্থের সামর্থ্য নেই। দেশে না ফেরা পর্যন্ত কারও ঋণই শোধ করতে পারব না। আর ঋণ আমাকে দেবেই বা কে?

উমেদ সিং আহত হলেন বলে মনে হল। বললেন: ছি ছি, অমন কথা মুখেও এনো না। তুমি আমার দেশের লোক। তোমাকে এমন অসহায় ফেলে গেলে যে নরকেও আমার স্থান হবে না।

একটু থেমে বললেন: যাদের কাছে তুমি আছ, তারা তো মানুষ নয়, তারা পশু। আজ আদরে আহ্লাদে তোমাকে দেবতার মতো বুকে করে রেখেছে, কাল হয়তো মজা দেখবার জন্যেই পেটের ভেতর ছোরা চালিয়ে দেবে। গ্যাকার্কোর এই মণ্ডি ছাড়লে তারা সব

সাধু হয়ে যায়। তীর্থপুরী ঘুরে যাবে কৈলাস। যে যত পাপী, সে তত ধার্মিক সাজবে। যে হতভাগা সারা বছর লুটপাট করে খেয়েছে, সে কৈলাস পরিক্রমা করবে দণ্ড খেটে খেটে। আর উচ্চস্বরে পাপ স্বীকার করবে কৈলাসের দেবতার কাছে। দেখে তোমার আশ্চর্য লাগবে, ভাববে, এমন ধার্মিকও হয় পৃথিবীতে! তারপর ফুঁতুর কাছে ছুতেন ফুক গোম্পা ছাড়লেই একটা চাঙকু মেরে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সুরু করবে।

চাঙকু কী?

চাঙকু দেখনি? বড় কুকুরের মতো নেকড়ে। যদি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে মারে, তা হলে বলবার কিছু নেই। কিন্তু মারে আনন্দের জন্যে। অনেকদিন খুনজখম না করে হাতে খিল ধরেছে তো, তাই একটু তাক্ পরীক্ষা করে দেখে নেয়। চাঙকু না পেলে হয়তো একটা মানুষ মেরেই হাতের খিল খুলবে।

বৃদ্ধের কথার ধরনে তাঁর ঘৃণা প্রকাশ হয়ে পড়ছিল। গল্পের ভিতর খানিকটা সত্য আছে ভেবে ভয়ও পেলুম।

খদ্দেরের আনাগোনা আর নেই। উমেদ সিং বললেন: কাজকর্ম তো প্রায় শেষই হয়ে গেছে, সময় আজকাল কাটে না। তুমি বরং আজই আমার কাছে চলে এস।

তারা ক্ষেপে যাবে না তো?

বৃদ্ধ একটু চিন্তা করে বললেন: তোমার বন্ধু লামাটি কোন ব্যবস্থা করতে পারবেন না? এদেশে ওঁরাই তো সর্বেসর্বা।

বললুম: জিজ্ঞেস করে দেখব।

উমেদ সিং আমার শুষ্ক রুক্ষ চেহারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বললেন: আমার একটা কথা শুনবে?

নিঃশব্দে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

বৃদ্ধ বললেন: স্নান খাওয়াটা আজ এইখানেই সেরে নাও।

স্নানের নামে সারা দেহে কাঁটা দিয়ে উঠল। দেশে দু বেলা স্নান

না করে থাকতে পারি নে। আলমোড়াতেও নিয়মিত স্নান করেছি হঠাৎ বিশ্বাস হল না যে স্নান না করে আমি এতদিন কাটিয়েছি। বললুম : কিন্তু আমার কাপড় গামছা কিছুই যে সঙ্গে নেই।

উমেদ সিং বললেন : অতিরিক্ত কাপড় আমারও নেই। কিন্তু গামছা আছে, সাবান তেল আছে। দাড়ি-গোঁফও কামিয়ে নিতে পার।

একটু ভেবে বললেন : হ্যাঁ, ব্যবস্থা হবে নাই বা কেন? আমার স্ত্রীর ভাল আলোয়ান আছে। তাই জড়িয়ে খানিকক্ষণ থাকতে পারবে না? এমন সুন্দর রোদ উঠেছে আজ, জামাকাপড়গুলো সাবানে কেচে রোদে মেলে দিলে দেখতে দেখতে শুকিয়ে যাবে।

চমৎকার ব্যবস্থা।

দোকানের বাইরে এসে উমেদ সিং তাঁর ঝব্বুওয়ালাকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন। সে লোকটা কাছেই ছিল। দুটো বালতি দিয়ে তাকে জল আনতে পাঠালেন। কাছেই কোথায় জল পাওয়া যায়।

এতদিনে আমি নিজের দিকে তাকাবার অবসর পেয়েছি। হঠাৎ মনে হল, তিব্বতীদের সঙ্গে যেন আমার প্রভেদ আর খুঁজে পাচ্ছি না। ওদের মতোই নোংরা লাগছে নিজেকে। কী করে কাটাচ্ছিলুম সেই ভেবে হঠাৎ ঘেমে উঠলুম।

খানিকটা জঞ্জালের ভিতর থেকে বৃদ্ধ তাঁর ক্ষুর বার করলেন। নিজের মুখখানা পরিষ্কার কামানো। গোঁফ-দাড়ি এত কম যে ঘন ঘন কামাবারও দরকার হয় না। একখানা ছোট আয়না সামনে রেখে মুখে খানিকটা জল বুলিয়ে কামানোটা সেরে নিলুম।

উমেদ সিং একখানা নতুন সাবান দিলেন, আর একখানা নতুন গামছা। স্নান সেরে সেখানা পরাও গেল। জামা-কাপড়গুলো কেচে তাঁবুর দড়িতে মেলে দিলুম।

একটা বাক্সের ভিতর খানিকটা গন্ধতেল ছিল। তারই খানিকটা হাতে নিয়ে হাসি পেল। এমন প্রসাধন বুঝি জীবনে কখনও করি নি। তিব্বতী মেয়ে যেমন বিয়ের দিনে প্রথম প্রসাধন করে।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন শুকনো জামা-কাপড় পরে চুল আঁচড়ে ফরাশে বসলুম, রহস্য করে বুড়ো তাঁর ছোট আয়নাটা আমার মুখের সামনে ধরলেন। লজ্জাই পেলুম খানিকটা। খানিকক্ষণ আগের কথা স্মরণ করে মনে হল, একখানা গোড়ের মালা গলায় পরলেই বিয়ে করতে যেতে পারি। অনেকক্ষণ ধরে হাসলুম।

উমেদ সিংও মুখ হাত ধুয়ে নিয়েছিলেন। বললেন: এবারে দুটো খেয়ে নাও।

বললুম: ওদিকে তো কাউকে কিছু বলে আসি নি।

বুড়ো হেসে বললেন: নষ্ট হবার মতো খাদ্য তো ওদের নেই। মাংস যত শুকবে, তত তার আস্বাদ বাড়বে। ওই মাংস খাচ্ছ তো মদে ভিজিয়ে ভিজিয়ে?

যাদের খেয়ে বেঁচে আছি, তাদের নিয়ে রসিকতা করতে পারলুম না। সত্যি কথাটুকুই জানিয়ে দিলুম। দই আর ছাতু খেয়েই বেঁচে আছি। আর তৃষ্ণার সময় চা।

বৃদ্ধ হেসে বললেন: গিন্নী আজ আলুর ঝোল রেঁধেছে। অড়হরের ডাল আর আটার রুটি। আচারও মিলবে খানিকটা।

বললুম: এ যে রাজভোগ! পেটে সহ্য হবে তো?

উমেদ সিং হাসলেন। একটু ব্যথার ইঙ্গিত পেলুম তাঁর চোখের দৃষ্টিতে।

খেতে খেতে বললেন: তুমি আর ওদের কাছে ফিরে যেও না।

সে কথার কোনও জবাব দিতে পারলুম না।

আচারের খানিকটা লঙ্কা দাঁতে কেটে বুড়ো বললেন: তোমার বয়স আমার বড় ছেলের মতোই হবে। স্ত্রী পুত্র নিয়ে সে সংসার করছে। তোমার কি কেউ নেই দেশে?

কেন এ কথা ভাবছেন বলুন তো?

বুড়ো বললেন: কোন উদ্যোগ আয়োজন নেই, কোন সঙ্গী নেই, এমন দুর্গম পথে বেরিয়ে পড়লে একটা খেয়ালের বশে। দেশে ফিরে

যাবার জন্যও যে খুব ব্যস্ত হয়েছ, তাও মনে হয় না। কিছুরই কি টান নেই সেখানে ?

এ কথার কী জবাব দেব !

বৃদ্ধ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বললুম : যে জন্যে এত পথ কষ্ট করে এলুম তা তো এখনও দেখতে পাই নি। কৈলাস আর মানস সরোবর।

গভীর দৃষ্টিতে বৃদ্ধ আমার দিকে তাকালেন। মনে হল, ওই দৃষ্টি দিয়ে তিনি আমার অন্তরের খবর নিচ্ছেন ডুবুরীর মতো।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। বুড়ো বললেন : চল, তোমায় আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।

পথ চলতে চলতে মনে হল, বৃদ্ধকে যত সরল মনে হয়েছিল প্রথম দর্শনে তত সরল তিনি নন। আমার সম্বন্ধে কোথায় একটু সন্দেহ জেগেছে তাঁর। সেটুকুর সংবাদ নেবার জন্যই বুঝি আমার সঙ্গে এখন চলেছেন।

দুপুরের রোদ তখন তীব্র হতে শুরু করেছে।

ষোল

নিমা তার তাঁবুর বাহিরেই দাঁড়িয়েছিল। বোধ হয় আমারই অপেক্ষায়। কিন্তু লামা পাশে নেই। আমাকে দেখে কী প্রশ্ন করল বুঝতে পারলুম না। জবাব দিলেন উমেদ সিং। আরও খানিকটা কথোপকথন হল তাদের।

আমি উমেদ সিংকে তার অর্থ জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি বললেন, লামা ও আমার জন্য তারা অপেক্ষা করছে। সেই সকালে বেরিয়েছি, এখনও ফিরছি না কেন, এই ভেবে তাদের ভাবনা হচ্ছে।

বললুম: লামা তো অনেকক্ষণ হল ফিরেছেন।

উমেদ সিং বললেন: কোনও বিপদ হয় নি তো তাঁর?

আমি ওয়াং ডাকের তাঁবুটা একবার দেখে নিলুম। ওয়াং ডাককে জাগিয়ে রেখেছে তার চাকর। সেই সনাতন পদ্ধতিতে সেবা চলেছে।

বেরিয়ে আসতেই উমেদ সিং জিজ্ঞাসা করলেন: এখানে এমন কোন চেনা লোক আছে, যেখানে গেলে লামার খোঁজ পাওয়া যেতে পারে?

বললুম: আছে।

সুন্নু আঙমার জন্য তাঁর দুর্ভাবনার কথা আমি জানি।

বৃদ্ধ বললেন: তাহলে চল, সেই জায়গায় তাঁর খোঁজ করে আসি।

সত্যিই লামার খোঁজ পাওয়া গেল সুন্নু আঙমাদের তাঁবুতে। লামা সেখানে জাঁকিয়ে বসেছেন। সুন্নু আঙমার বাবা নেই, বাহিরে কোথাও ব্যবসার ধান্ধায় গেছেন। সুন্নু আঙমা লামার খুব কাছে ঘনিয়ে বসে নানান গল্প শুনছে।

আমাদের দেখে তাঁরা এতটুকু অপ্রতিভ হলেন না। স্মিত হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল লামার মুখ। বললেন: খোঁজ করতে এসেছ তো? আমি জানি আসবে।

সেই থেকে কি এখানেই বসে আছেন?

লামা হেসে উত্তর দিলেন: না থেকে আর উপায় কী! এখানে এসে দেখি, মেয়েটা একা আছে। তার বাপ এলে উঠব, কিন্তু সে ভদ্রলোকের আর দেখা নেই।

এদের কি চাকর বাকর নেই?

আছে এক গণ্ডা, কিন্তু কারও কি আক্কেল আছে এতটুকু। কাল যখন কুমা এদের যথাসর্বস্ব চুরি করে গেল, কেউ কি এগিয়ে এসেছিল? আজ যদি মেয়েটাই হারিয়ে যায়?

ভাবনার কথা মানতেই হল।

লামা আবার হেসে বললেন: তা তোমরা যখন এসে পড়েছ তোমরাই বস এবার। আমি ফিরে যাই।

উমেদ সিং বসতে রাজী হলেন না। তাঁর দোকান ফেলে এসেছেন। খদ্দের না এলেও কুমা আসতে পারে। বুড়ি একা আর কদিক সামলাবে!

একটা উপায় ভাবছি, এমন সময় সুন্দু আওমার বাবাই ফিরে এলেন। একদিনেই ভদ্রলোকের চেহারা একেবারে ভেঙে পড়েছে। মনে হচ্ছে, মাঝখানের দুটো দিন যেন দুর্ভিক্ষের দুটো বছর গেছে। হাতের আস্তিনে কপালের ঘাম মুছে ক্লান্ত শরীরে মাটিতেই বসে পড়লেন।

উমেদ সিংএর দাঁড়াবার সময় নেই। রাত্রির নিমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি সরে পড়লেন। আমিও সরে পড়েছিলুম, লামা পিছনে হাঁক দিয়ে বললেন: আমি আসছি।

আমার দাঁড়াবার ইচ্ছা ছিল না অন্য কারণে। এমন নয় যে সুন্দু আওমার বাপের দুঃখে আমার সহানুভূতি নেই। সেই কথাটুকু প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই বলেই এমন সঙ্কুচিত বোধ করছি।

লামা দুটো কথা কইলেন ভদ্রলোকের সঙ্গে। তারপর বেরিয়ে এলেন।

বললেন : খাওয়া দাওয়া সারা হয়েছে তো তোমার ?

আমি আমার ভোজের গল্পটা শোনালুম।

লামা হাসলেন। বললেন : অনেকদিন পরে দেশের খাবার খেলে এমনিই মনে হয়। দেশে ফিরে দেখো, আরও কত কী মনে হবে !

একটু থেমে বললেন : আমিও আমার দুপুরের আহার সেরে নিয়েছি। চল, আজ তোমাকে একটা নতুন জিনিস দেখিয়ে আনি।

সে কি, কোথায় আবার যেতে হবে ?

হাঁটার নামে ভয় পেলে নাকি ?

ভয় নয়, কর্তব্য একটু সেরে যেতে হবে। নিমা আপনার জন্যে অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে।

লামা লজ্জিত হলেন ; বললেন : সত্যিই তো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে আজ।

ভুল সংশোধন করে আমরা যখন বাজারের বাইরে এসে উপস্থিত হলুম, লামা বললেন : এই হচ্ছে রেতাপুরীর পথ। পালদেন অতীশা এর নাম বোধ হয় তীর্থপুরী রাখেননি, রেখেছিলেন প্রেতপুরী। প্রথম দর্শনে এ দেশের লোককে প্রেত ছাড়া অন্য কিছু হয়তো ভাবতে পারেন নি। তাই এমন নাম দিয়েছিলেন ওই জায়গাটার। সংস্কৃত শব্দের অর্থ এরা জানে না, তাই রক্ষে। আজও তাদের এ নামের গর্ব যায় নি।

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম আমি জানি। তিনি আমাদের বাংলার বিক্রমপুরের মানুষ। বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর মতো পণ্ডিত ছিলেন না একাদশ শতাব্দীতে। সমগ্র ভারত ও সিংহল পরিক্রমা শেষ করে তিনি বিক্রমশিলার মহাবিহারের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিব্বতে যান ধর্মপ্রচারে। তিয়াত্তর বছর বয়সে লাসায় তাঁর মৃত্যু হয়। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর অবতার বলে আজও তিনি তিব্বতের মঠে মঠে গভীর শ্রদ্ধায় পুজিত হচ্ছেন।

লামা বললেন : আজ সকালে তুমি লাল টুপির যে লামা দেখলে,

তাঁদের মানুষ করবার জন্যে এসেছিলেন অতীশা। লামারা তখন লাল টুপি মাথায় দিয়ে ব্যভিচারের শেষ ধাপে উঠে দেশকে কলুষিত করে চলেছেন ধর্মের নামে। লোছেন পেমা চুঙনে নামে একজন তান্ত্রিক এই লাল টুপির লামা-ধর্ম প্রবর্তন করেন। লোকে বলে কাবুলে তাঁর জন্ম। আর এমন চমকপ্রদ তাঁর জীবনী যে অতি সরলবিশ্বাসী লোকেরও তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে। জীবনকে চরমভাবে উপভোগ করাই ছিল তাঁর ধর্মের প্রধান শিক্ষা। লামারা বিবাহ করবে, মদ ও মাংস খাবে, জীবনের কোন বাসনা-লালসা অপূর্ণ রাখবে না - এই তাঁর নির্দেশ। এতেই মানুষ বুদ্ধ হবে, এতেই তার মুক্তি। এ সবের যুক্তি তিনি প্রচার করেছেন। সে যুক্তি এমন অশ্লীল যে বৌদ্ধ হয়ে আমি তা মুখে আনতে পারব না। দেশ তখন উচ্ছন্নে যেতে বসেছে।

তিব্বতের এই চরম দুর্দিনে এলেন অতীশা। তাঁর শিষ্যেরা হলদে টুপি মাথায় পরে ধর্মের সত্য ব্যাখ্যা শুরু করলেন। অতীশের ধর্মকে আরও সংযত করলেন জেসং খা-পা। নামে একজন তিব্বতী লামা। তাঁরাই প্রথম জানালেন যে ধর্মগুরু হতে গেলে চারিত্রিক সংযমই হল সবচেয়ে বড় কথা। ধর্মের অপবিত্রতা একদিনে যাবে না বুঝে লাল টুপির অনেক অসংযমকে তাঁদের সেদিন মেনে নিতে হয়েছিল।

আজও তিব্বতে লামা ধর্মের এই দুটি শাখা চলে আসছে—লাল টুপি আর হলদে টুপি।

একটু ভেবে লামা বললেন : আরও একটা ধর্ম আছে এ দেশে। সেটার নাম পন্ ধর্ম। বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হবার আগে এই ধর্ম ছিল তিব্বতের নিজস্ব জিনিস। তখন হিন্দুধর্মের সঙ্গে পার্থক্য বোধ হয় সামান্য ছিল। বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে এসে তারও রূপ বদলাল অনেকখানি। পন্ ধর্মের কোন মন্দির বা মঠ নেই, তাদের দেবতারা থাকেন উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় তুষারশৃঙ্গে বা পর্বতবেষ্টিত সরোবরে।

এদের ধর্মগুরুরা বিয়ে করতে পারেন, পশুহত্যা বা মদ্যপানেও এদের আপত্তি নেই।

পথ চলতে চলতে আমরা কথা বলছিলুম। একসময় জিজ্ঞাসা করলুম: আজ কোথায় নিয়ে চললেন?

লামা বললেন: আজ তোমার উমেদ সিংএর দোকান থেকে ফেরার পথে একজন মহাত্মার সঙ্গে আলাপ হল। তিনি বললেন, রেত্তাপুরীর পথে এক ছোট্ট গুহায় একজন সাধু আছেন। সম্ভব হলে তাঁর সঙ্গে যেন দেখা করে যাই।

খানিকটা পথ নীরবে অতিক্রম করবার পর বললেন: লোকালয় থেকে দূরে পাহাড়ে কন্দরে গুহার ভেতরে তপস্যা করবার এই শিক্ষা বোধ হয় তোমাদের দেশ থেকেই এসেছে।

তেমনই চিন্তাগ্রস্তভাবে বললেন: এদের ভালমন্দ সবই এসেছে তোমাদের দেশ থেকে। সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা সংছেন গ্যাম্পো ভারতবর্ষ থেকে আনিয়েছেন তিব্বতের উঁচে ইগে, প্রথম বর্ণমালা! পরবর্তী শতাব্দীতে থিসোঁ দিউছেন পদ্মসম্ভবকে আমন্ত্রণ করে আনেন। ইনিই তিব্বতের লামা রিমপোছে। তার পরের শতাব্দীতে রাজা রল পসন বহু ভারতীয় পণ্ডিতকে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সুযোগ দেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমানে এই প্রচারকার্য চলেছিল।

আমি বললুম: এবারে ভারত থেকে মন্দ কী এসেছে তাই বলুন।

সেটা আমার ব্যক্তিগত মত। আমার মনে হয় তিব্বতের ধর্মে এই অসংযম এসেছে ভারতীয় তান্ত্রিকদের কাছ থেকে।

যদি তর্ক করতে দেন তো কিছু বলি। আপনি একটু আগে বলেছেন যে কাবুলের এক তান্ত্রিক প্রথম এসে অসংযম প্রচার করেছেন তিব্বতের ধর্মে।

লোকে তাই বলে বটে। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে, তন্ত্রমতের জন্মস্থান যখন ভারত, তখন ভারত থেকেই

এই তন্ত্রমত অন্যত্র বিস্তৃত হয়েছে। সাধারণ লোকে তার মূল অর্থটুকু বাদ দিয়ে অসংযমকেই গ্রহণ করেছে। অসংযম মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। সভ্য হয়েও অসংযমকে আমরা বাদ দিতে পারি নি, কালো পর্দা দিয়ে শুধু আড়াল করে রাখি। অসংযমের প্রতি আকর্ষণও আমাদের সনাতন।

আমি কোথায় যেন পড়েছিলুম, তিব্বত থেকে আমরা তন্ত্রশাস্ত্র পেয়েছি। সে প্রসঙ্গ তোলবার আগেই লামা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন। দেখলুম, দক্ষিণের পাহাড়ের গায়ে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। খানিক-ক্ষণ লক্ষ্য করে বললেন: না, এখানে নয়। আর একটু এগোতে হবে আমাদের।

বলে আবার অগ্রসর হলেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করলুম।

লামা বললেন: তোমাদের আরও একটি জিনিসের সঙ্গে তিব্বতী-দের মিল দেখতে পাই। সেটা তাদের জাতিভেদ। সমাজের সমস্ত লোককে তাদের পেশা দিয়ে চারটি জাতিতে ভাগ না করলেও চারটি সুস্পষ্ট বিভাগ আছে এদেরও। পুরনো রাজা তালে লামা ও বিশিষ্ট রাজকর্মচারীদের পরিবারকে নিয়ে যে জাত তার নাম গের-পা। ঙাক পার কথাও তোমাকে বলেছি। তৃতীয় হল পন্-পো। তাঁদের কথাও একটু আগে বললুম। আর চতুর্থ হল শাল-গোঁ, এরা পুরনো সর্দারদের পরিবার। সাধারণ লোকেদের ভেতরও দুটো জাত আছে, টং-বা আর টং-ডু। যাদের ভেতর তুমি আছ, তারা সব টং-বা জাতের। ওয়াং ডাক টং-বা না হয়ে যদি টং-ডু হত, তা হলে সুমু আঙমাকে বিয়ে করার ইচ্ছা সে প্রকাশ করতেও সাহস পেত না। বিয়ে তো দূরের কথা, এক সঙ্গে বসে খাবার অধিকারও তাদের থাকত না।

একটু থেমে বললেন: এ দেশের হরিজন হল, জেলে মাঝি কামার আর কশাই।

এবারে আর ভুল হল না লামার। গুহার মুখটি স্পষ্ট দেখা যেতেই আমরা পথ থেকে পাহাড়ের দিকে নেমে পড়লুম। বেলা তখন আর

বেশি ছিল না। দক্ষিণের সূর্য পশ্চিমে হেলেছেন অনেকক্ষণ। ক্রমেই তাঁর বিদায় নেবার সময় এগিয়ে আসছে।

অস্বচ্ছ আলোর ভিতর আমরা সেই তপস্বী পুরুষকে দেখলুম। বুদ্ধের ধ্যানমূর্তি সামনে নিয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন। মনে হল, আমি এমনই একজন তপস্বী পুরুষের সন্ধান পেয়েছিলুম।

আমাদের উপস্থিতি অনুভব করে তিনি চোখ খুললেন, কিন্তু কথা কইলেন না। কে একজন ভক্ত কিছু ছাতু আর চা রেখে গিয়েছিল, সেগুলি তেমনিই পড়ে আছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন নেই একেবারেই।

লামা কথা কইবার চেষ্টা করলেন। উত্তর পেলেন না। চারদিক ঘুরে পুঁথিপত্রের সন্ধান করেও বিফল হলেন। আর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দুজনে বেরিয়ে এলুম।

ফেরার পথে আবার লামা গল্প শোনালেন। বললেন: এরাও এক শ্রেণীর লামা। আসনসিদ্ধ যোগী পুরুষ। ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় করে বুদ্ধের আরাধনা করছেন। এ দেশের আবহাওয়ায় শরীরের ক্ষয় নেই, তাই এমন সাধনা সম্ভব। তুমি লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না, ওঁর পা দুখানা এমনই শীর্ণ যে মনে হল পঙ্গু। পায়ের নখগুলো দীর্ঘ হয়ে বেঁকে গেছে। বেশি চলাফেরা না করার জন্যেই বোধ হয় এমন হয়েছে।

একসময় বললেন: তুমি এইখান থেকে ফিরে যাবে। সত্যিকার লামার সঙ্গে তোমার পরিচয় হল না, এই আমার দুঃখ। আজ তোমাকে এইজন্যেই এতদূর টেনে এনেছিলুম। কিন্তু ইনি কথা বলেন না জানলে এতদূর তোমাকে আনতুম না।

একটু থেমে বললেন: লামা মানে সর্বত্যাগী মুক্ত পুরুষ। এঁরা চিরকুমার। শৈশবে মঠে আসেন, মঠের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে লাসায় যান উচ্চশিক্ষার জন্যে। যেখান থেকে ফিরে এলে তাঁর দ্বাদশ বর্ষ সংযম-শিক্ষা। মঠের একখানা ছোট ঘরে তাঁকে একাকী সাধনা

করতে হয়। তাঁর খাদ্যাদি দেওয়া হয় ক্ষুদ্র কোনও দ্বারপথে। এই সংযম-শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে তিনি কোনদিন মঠাধ্যক্ষ হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এঁরা সর্বশাস্ত্রজ্ঞ সংযমী পুরুষ। প্রয়োজন না হলে কথা বলেন না। নিকটের লোককে ইঙ্গিতে ডাকেন, আর দূরের জনকে ডাকেন ছোট ঘণ্টা নেড়ে। এমনই কোন লামার সঙ্গে শাস্ত্র-বিচার করে তুমি তৃপ্ত হতে। লামাদের সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে দেশে ফিরতে পারতে।

খানিকক্ষণ কী ভাবলেন তিনি। তারপর বললেন : ফেরার পথে তুমি দুটি মঠ পাবে। একটি পুরাঙের, আর একটি কোজর জোতে। আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি একটি মঠ অন্ততঃ দেখে যেও। মঠের আড়ম্বর তোমাকে দেখতে বলি না। পাহাড়ের ওপর ইট-কাঠে তৈরি অপূর্ব আকার এই সব মঠের। ভেতরে প্রাঙ্গণ আছে, উৎসবের দিনে লোকের ভিড় আছে। কোন স্থানে দেয়ালের গায়ে ছোট ছোট ঢোলের মত যন্ত্র দেখবে সারি সারি সাজানো আছে। লোকেরা সেগুলোও ঘুরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সবাই সব-কিছু প্রদক্ষিণ করছে। কোথাও দেখবে বিরাট বুদ্ধমূর্তি। তার কাছে বিরাট প্রদীপ। তেমনই বিরাট পাত্রে মাখন আছে বাতির জন্যে। বিরাট সানাই, কাড়া-নাকাড়া, ঢালের মতো বিরাট করতাল। উৎসবের দিন বাজনা বাজবে, মদের উগ্র গন্ধের সঙ্গে মিশবে ধূপের গন্ধ। লামারা সারি দিয়ে বসবেন। প্রধান লামার মন্ত্রাদি পাঠের পর ছাতু দই আর চা খাবেন। তাদের সাজসজ্জা সাধুতা ভণ্ডামি সব আছে। আমি সে সব তোমাকে দেখতে বলছি না। এ সমস্ত এড়িয়ে তুমি এঁদের লাইব্রেরিতে গিয়ে বস। পুরনো পুঁথিগুলি টেনে টেনে বার করে শুধু দেখে যেয়ো। এমন রত্ন নেই, যা তুমি পাবে না। বৌদ্ধধর্মের ওপর যে পুঁথি তুমি সারা পৃথিবীতে খুঁজে পাবে না, সেই অমূল্য মণি হয়তো এঁদেরই একটা মঠে তুমি দেখতে পাবে। এই সব মঠের প্রধান লামার সঙ্গে ভাব ক'র। দেখবে কী অগাধ তাঁদের জ্ঞান! কোন বিষয়ে তোমার

সন্দেহ হলে তার মীমাংসা চেয়ে নিও। তোমাকে শুধু বুঝিয়েই দেবেন না, বলে দেবেন কোন্ মঠে গেলে কোন্ পুঁথিতে এই মীমাংসার কথা লেখা আছে। লামাদের সম্বন্ধে তুমি যে ধারণা নিয়ে ফিরে যাচ্ছ, সেই শুধু সত্যি নয়। আরও যা সত্যি আছে, তা তুমি দেখে যেতে পারলে না বলেই আমার আজ দুঃখ হচ্ছে।

এক সঙ্গে এতখানি কথা বলে লামা যেন হাঁপাতে লাগলেন। তখন পাহাড়ের ছায়া পড়েছে পথের উপর আর সূর্যের আলো হারিয়ে গেছে পাহাড়ের পিছনে। মনে হল, কোথায় যেন আমাদের অন্তরের যোগ হয়েছে। আসন্ন বিদায়ের কথা ভেবে ব্যথা লাগছে বুকের কাছ-টায়।

সত্তর

সন্ধ্যে থেকেই লামাকে আর দেখতে পাই নি। আমাকে উমেদ সিংএর তাঁবুতে পৌঁছে দিয়ে কোথায় যে তিনি সরে পড়লেন, রাতে আমার পক্ষে খুঁজে বার করা আর সম্ভব হল না। নিমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই, সে আমার কথা বুঝতে পারবে না।

আজ তাঁবুর ভিতর শুধু আমরা দুজন—নিমা আর আমি। ছোট ছেলেটা এক ধারে পড়ে অঘোরে ঘুমচ্ছে। শোবার কথা মনে হতেই প্রাণে বড় অস্বস্তি বোধ হল। তাঁবুটা তো কোন ধর্মশালার হলঘর নয় যে, একরাশ মেয়ে পুরুষ ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয়ে শুয়ে ঘুমব। আজ প্রথম মনে হল যে, কত অপ্রশস্ত এই তাঁবুগুলো। কত নিচু তার ছাদ! দুটো মানুষ শুতে গেলেও গায়ে গা ঠেকে যায়, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস লাগে। মনে হল, এ অসম্ভব। এই মাখনের প্রদীপটুকু জ্বলছে বলেই এখনও আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। এটুকু নিবিয়ে দিলেই হয়তো গভীর অন্ধকার তার দুখানা হাত বাড়িয়ে আমার গলা টিপে ধরবে।

আর একবার তাকালুম নিমার দিকে, খুব পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে তাকে। অদ্ভুত সুন্দর! প্রশান্ত দৃষ্টি নিয়ে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে। আরও গভীর ভাবে তাকে দেখলুম, তবু তার মনের ভাব পড়তে পারলুম না তার ঠোঁটের টানে। দৃষ্টিতেও কোন অর্থ নেই যেন। মানুষ এমন উদাসীন হয় কী করে! মুখ যেখানে মূক, অন্তরটা বাচাল হোক না আচরণে!

মনে হল নিমা বুঝি সজীব নয়। কাঠ আর খড়ের উপর মাটি চড়িয়ে মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে তাকে। প্রাণ থাকলে তার চঞ্চলতা থাকত। এমন করে একটা পুরুষমানুষের সামনে নিঃশব্দে নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে তাকে বিভ্রান্ত করত না। রাগ হল তার উপর, আমার

দিয়েছে বলে এমন অসহায় হতে তো আমি চাই নে। এ কোন্ ছলনা তার ?

ইচ্ছে হল, কঠিন ভাষায় আমি এ অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে দিই। চিৎকার করে তাকে কিছু কটূকথা শোনাই। কিন্তু—

আবার দেখলুম নিমাকে। এতটুকু অসংযমের চিহ্ন নেই তার চোখে মুখে, তার দেহের ভঙ্গিমায়। পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে বুঝি আমার আজ্ঞার অপেক্ষা করছে। আরও অসহায় মনে হল নিজেকে। যা বলতে চাই তা যদি বলতে না পারি, তার চেয়ে দুঃখের বুঝি কিছু নেই। রাগ হল দুনিয়ার লোকের উপর। এতগুলো ভাষাকে প্রশ্রয় দিয়ে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখছে মানুষের কাছ থেকে।

রাগ হল লামার উপর। সে লোকটাকে আজ এই মুহূর্তে সামনে পেলে তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ফেলতুম। বুড়োটা কি শেষে সুন্থু আওমার তাঁবুতেই গিয়ে ঢুকল !

নিমা তখনও তেমনই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এ মেয়েটাই বা কী রকম ! হলই বা তিব্বতী, একটুখানি অনুভূতি থাকলে কার কী ক্ষতি হত ? যত দায়, সবই কি আমারই !

মনে হল, এমন চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বুঝি আমার দুর্বলতারই পরিচয় দিচ্ছি মেয়েটার কাছে। মনে হল, ভাবনার যদি কিছু থাকে তো ওই মৌন মেয়েটাই ভাবুক। আমি কেন পরের ভাবনা ভেবে নিজের মাথাটাকে ক্লান্ত করি।

হঠাৎ এক ঝলক আরাম পেলুম। সত্যিই তো, পরের ভাবনা আমি কেন ভেবে মরছি ! লামা নেই, নিমা তো আছে। নিমা আর আমি। ছেলেটা ঘুমচ্ছে। তারপর আমরাও ঘুমব। তাঁবুর ভিতর যথেষ্ট জায়গা আছে।

দেওয়ালের কাপড়ের উপর প্রদীপের আলো পড়েছিল। সাদা কাপড়ের উপর কালো কালো দাগ পড়েছে। বোধ হয় বৃষ্টি আর ঝড় তার চিহ্ন রেখে গেছে। 'এদিকেও বৃষ্টি পড়ে, কিন্তু সে বৃষ্টি আমাদের

দেশের মতো নিশ্চয়ই নয়। সেদিন যে বৃষ্টি দেখলুম, সে তো বৃষ্টি নয়, শুধু বিদ্যুৎ আর শিলা। বড় তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ আর ঠাণ্ডা শিলা! আমাদের দেশে এখন বর্ষা নেমেছে। মেঘে মেঘে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, গুড় গুড় করে ডাকবে সেই মেঘ। তারই সঙ্গে অবিশ্রাম বর্ষণ। সেখানকার মেঘে কত জল ধরে! শুধু বিদ্যুতে আর শিলাতেই আমাদের দেশের বর্ষা শেষ হয়ে যায় না। চোখের সামনে দেখলুম, বাংলার আকাশ বেয়ে অঝোরে জল ঝরছে।

নিমাকে হঠাৎ ভারি ভাল লাগল।

সকালবেলা ওয়াং ডাকের তাঁবুর সামনে দেখলুম লামাকে। খানিকটা জল নিয়ে আঙুলে ঘসে দাঁত মাজছেন। আমাকে দেখতে পেয়েই খুশী হলেন, প্রফুল্ল হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর মুখখানা। বললেনঃ রাতে ভাল ঘুমিয়েছ তো?

সে কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। বললুমঃ কিন্তু আপনি হঠাৎ কেটে পড়লেন কেন বলুন তো?

লামা বললেনঃ কেটে পড়ি নি তো। ক্ষতগুলোর ব্যথায় ওয়াং ডাকের অনেক জর এসেছিল, তার উপর পাঁজরার ব্যথা। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিল লোকটা। সুন্থু আঙমাদের কাছ থেকে ফিরে এসে শুনি, কাউকে সে তার রোগ দেখাবে না। তার চাকর একজন লামাকে ডেকে এনেছিল, যা তা বলে ওয়াং ডাক তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, বিনে চিকিৎসায় সে এইখানেই মরবে, তবু লামার দেওয়া প্রাণ সে কিছুতেই দেশে নিয়ে ফিরবে না। কাজেই বুঝতে পারছ, আমার আর ফেরা হল না।

এখন কেমন আছে?

অনেকটা ভাল, রাতের মতো আবোল-তাবোল আর বকছে না তবে দু-একদিনে সেরে উঠবে বলে মনে হয় না।

সুন্থু আঙমাদের খবর জিজ্ঞাসা করলুম।

লামা বললেন : তাঁদের কাছেই এখন যাচ্ছি। মেয়েটাও বিশেষ ভাল নেই। সারাদিন কান্নাকাটি করছে।

জলের পাত্রটা ওয়াং ডাকের চাকরের হাতে দিয়ে বললেন : তোমরা কবে ফিরছ? সময় পেলে দেখা ক'র একবার।

এক বাটি স্তুজা গিলে আমিও বেরিয়ে পড়লুম। গ্যাকার্কোর হাট তখন ভাঙতে শুরু করেছে। মনে হল, আমাদের জীবনের হাটেও ভাঙন ধরেছে। সুখে হোক দুঃখে হোক, এতদিন আমরা এক পরিবার-ভুক্ত ছিলুম। ওয়াং ডাক যখন ছেরিং পেনছোর সঙ্গে তাদের হিংসার ছুরিতে শান দিয়েছে, তখনও তাদের পর মনে হয় নি। আজ নিমার দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারি নি, বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়েছে তাকে। অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য ছেরিং পেনছো ছুটে গেছে কোন্ অজ্ঞাত পথে। তার জীবনটা নিমা খরচের পাতাতেই লিখে রেখেছে। ফিরে যদি আসে সে হবে তার সৌভাগ্য। তার বড় স্বামী হয়তো আসবে। না ফিরলেও আশ্চর্য হবে না নিমা। সুনু আঙমা তার লামাকে হারিয়েছে। ওয়াং ডাক তো আর তাকে চায় না। আঘাতে আঘাতে সে লোকটা নিষ্ঠুর হয়ে গেছে। আমি ফিরে যাচ্ছি আমার নিজের দেশে। কাল সন্ধ্যাবেলায় দেখেছিলুম, এই ভাঙন লক্ষ্য করে লামাও বিচলিত হয়েছেন অন্তরে অন্তরে। তাঁর মুখেও আর সে প্রশান্তি আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।

উমেদ সিংএর দোকানে যাবার পথে সুনু আঙমার তাঁবুটায় একবার উঁকি দিয়ে গেলুম। তার বাপ বেরিয়ে গেছে, কিন্তু সে তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠে নি। আমাদের লামা তার কপালে আর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আমি নিঃশব্দে সরে গেলুম। পিছনে আমার উপস্থিতি হয়তো কেউই লক্ষ্য করলেন না।

উমেদ সিং বোধ হয় আমারই অপেক্ষায় বাইরে পায়চারি করছিলেন। আমাকে আসতে দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন, বললেন : এতক্ষণ তোমারই অপেক্ষা করছিলুম।

আমি কিছু বলবার আগে নিজেই আবার বললেন : কাল অনেক রাত পর্যন্ত তোমার অপেক্ষা করেছি। ভেবেছিলুম, তুমি নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।

বললুম : আমিও তাই ঠিক করেছিলুম। কিন্তু সবই কেমন যেন গুলিয়ে গেল। রাতে আমাদের লামা ফিরলেন না। তিনি না থাকলে তো কোনও কথাই আমি বলতে পারি না।

উমেদ সিং মেনে নিয়ে বললেন : তা বটে।

তারপর উপদেশ দিলেন খানিকটা। বললেন : তিব্বতী মেয়েদের সঙ্গে বেশি মেলা মেশা ক'র না। আমার ঠাকুরদা বলতেন, ওরা ডাইনি। ওদের সুনজরে পড়েছ কি প্রাণটা গেছে। নিজেরা যা ইচ্ছে ওরা করবে, কিন্তু বিদেশীর নজরে পড়েছে দেখলে আর একটা রাতও তাকে বাঁচতে দেবে না।

কথা বলতে বলতে উমেদ সিং ভিতরে এলেন। ছোট ঘরে একবার উঁকি দিয়ে অনুচ্চস্বরে একটু গরম জলের হুকুম করে গদিতে বসলেন। বললেন : সেবারের গল্পটা তা হলে বলি তোমাকে।

এখন থেকে এই বৃদ্ধের গল্পই আমাকে শুনতে হবে। ভাবলুম আজই তার শুরু হোক। হেসে বললুম : ভারি মজার গল্প বুঝি?

শুধু কি মজার! ভয়ে তোমার বুক শুকিয়ে যাবে।

আমি উদ্‌গ্রীব হলুম।

বুড়ো বললেন : সেদিন—মানে অনেকদিন আগের কথা। তখন জোয়ান মানুষ। গঙ্গারাম আমার প্রাণের বন্ধু ছিল। লম্বায় চওড়ায় আমার প্রায় দেড়া, তেমনই গায়ের রঙ!

গলা নামিয়ে বললেন : দেশের মেয়েগুলো লোভীর মতো তাকিয়ে থাকত বলে বিয়েই করত না ছোকরা। বলত বিয়ে করলেই তো সব ফুরিয়ে গেল।

সেদিনের কথা মনে করে বুঝি বুড়োর চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠল।

বুড়ির গরম জল নিশ্চয় তৈরিই ছিল। দু হাতে দু গ্লাস চা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন: সেই গল্প শুরু হল তো। কত লোককে আর শোনাবে?

বুড়ির মুখে এ কথা বোধ হয় উমেদ সিং অনেকবার শুনেছেন। অপ্রতিভ বা বিরক্ত হলেন না এতটুকু। বললেন: কাল এই বাবুকে পৌঁছতে গিয়ে ঠিক আঙ্গি তপদেনের মতো একটি মেয়ে দেখে এসেছি। ঠিক সেই মুখ, সেই দেহ। কালই ভেবে রেখেছিলুম, বাবু এলে তাকে এই গল্প শোনাব। আমার দিকে ফিরে বললেন: নাও নাও, তোমার গেলাস ওঠাও, চা জুড়িয়ে যাবে।

বলে চায়ের গ্লাস হাতে নিলেন। আমিও নিলুম।

দু চুমুক গরম জল গলায় যেতেই গল্প জমালেন। বললেন: কাল সত্যিই আমার মনে হয়েছিল, অনেকদিন পরে আবার আঙ্গি তপদেনকে দেখলুম। সেই মুখ সেই দেহ। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি ছিল অন্যরকম। খানিকক্ষণ তোমার চোখের ওপর চোখ চেয়ে থাকলেই নেশা ধরবে তোমার, রক্তে ঝিমুনি আসবে। বুঝতে পারবে তুমি কেমন ভেড়া বনে যাচ্ছ। কসম তোমার, সে মেয়েটা নিশ্চয়ই জাদু জানত।

আরও খানিকটা চা খেলেন উমেদ সিং। তারপর বললেন: অমন নচ্ছার মেয়ে আমি আজও দেখি নি। এমন পাপ নেই যা সে হাসতে হাসতে করতে পারত না। তাকে সবাই নিনি কেন বলত জানি না, কুমারী তো ছিল না। তাকে নাহিলাই বলা উচিত। অনেকগুলো স্বামী ছিল তার। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের শক্ত সমর্থ যুবক। কিন্তু সব কটাকেই ভেড়া বানিয়ে রেখেছিল। চোখের সামনে অনাচার দেখেও মুখে তারা প্রতিবাদ করতে পারত না।

সেবারে আমার বাপ ছিলেন এখানে। আমি ছাউনি ফেলেছিলুম গ্যানিমার মণ্ডিতে। গঙ্গারাম আমার পাশেই তার দোকান খুলল। সেই বছর আঙ্গি তপদেন এ বাজারে প্রথম এল। কিন্তু প্রথম এলে

কী হবে? দেখতে না দেখতেই রাষ্ট্র হয়ে গেল যে সে এসেছে। একদিন আমরা দুই বন্ধুতে তাকে দেখতে গেলুম বিকেলবেলা। তার তাঁবুর সামনে পায়চারি করে করে সন্ধ্যে হয়ে এল, তবু সে একবারটি বেরল না। হঠাৎ শুনলুম মেয়েটা ক্ষেপে উঠেছে। অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে একজন লামাকে তার তাঁবুর ভেতর থেকে বার করে দিল। আমরা লুকিয়ে তার সেই অগ্নিমূর্তি দেখলুম। কিন্তু সেও আমাদের দেখে ফেলল। একটা বাঁকা দৃষ্টি হেনে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে গেল।

মাথা নিচু করে লামা বেরিয়ে গেলেন। সুশ্রী শক্ত চেহারা। বয়স হয়তো আমাদের চেয়ে কিছু বেশীই হবে। আমি গঙ্গারামকে বললুম ঃ দেখা তো হল, চল এবারে ফিরে।

গঙ্গারামেরও দেখা হয়েছিল, কিন্তু ফেরার কথায় তেমন উৎসাহ পেল না। তবু নিঃশব্দে আমার অনুসরণ করল। পথে শুধু একটি কথা বলেছিল গঙ্গারাম, তেজ আছে মেয়ের।

চা শেষ করে গেলাসটা নামিয়ে রাখলেন উমেদ সিং। বললেন ঃ আমি আর ও রাস্তা মাড়াই নি। বোধ হয় ভয়ই পেয়েছিলুম খানিকটা। গঙ্গারাম আর গিয়েছিল কিনা জানি না, একদিন সেই মেয়েটা তার দোকানে এল পাথর কিনতে। শুনেছিলুম, গঙ্গারাম নাকি একটা পাথরের দাম নেয় নি তার কাছে। দাম তার কাছে কে নিত, তাই জানত না কেউ।

একটা ঢোক গিলে বুড়ো বললেন ঃ গ্যানিমার বাজার সেবার জমল না। তচনচ করে গেল মেয়েটা। বিনি পয়সার সওদা দিয়ে সব পয়সা লুটে নিয়ে গেল।

তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আর হয়তো ভুলেই যেতুম সে ঘটনাটা, যদি না গঙ্গারামকে সঙ্গে নিয়ে যেত। ভগবান জানেন, কী হল ছোকরার। অমন দস্যুর মতো তেজ। বাজার ভাঙবার আগেই দেখলুম, আফিঙখোরের মতো ঝিমচ্ছে বসে বসে।

শেষটায় একদিন দোকানপাট সব ফেলে রেখে মেয়েটার সঙ্গে কেটে পড়ল।

পরের বছর তাদের আর দেখি নি। পরের বছরও না। বছরের পর বছর সারা মণ্ডিটায় তাদের খোঁজ করতুম, তাদের কথা জিজ্ঞেস করতুম তিব্বতী খদ্দেরদের কাছে। কেউ বলত, মানস আর রাক্ষসতালের মাঝে ফুতুর উত্তরে ছুতেন ফুক গোম্পা পর্যন্ত গঙ্গারামকে তারা দেখেছে। কেউ বলত, তার পরেও পূর্বের পাহাড়ের চূড়ো থেকে মানস সরোবরকে শেষ প্রণাম জানাতে তাকে দেখেছে। এইখেনেই তিব্বতীদের তীর্থ শেষ। এর পরে গঙ্গারামকে দেখেছে বলে কারও মনে পড়ে না।

উমেদ সিংএর চোখজোড়া হঠাৎ ছলছল করে উঠল। বললেন ঃ হাতের কাছে হয়তো কোন চ্যাঙকু পায় নি। সেবারে তাই গঙ্গারামের বুকে গাদা বন্দুকটা ছুঁড়েই হাতের খিল ভেঙেছে আঙ্গি তপ্‌দেনের স্বামীরা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঃ গঙ্গারামের বৃদ্ধ বাপ আসকোটে দোকান করতেন। আমি তার ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র তার বাপের দোকানে পৌঁছে দিয়েই পালিয়ে এসেছিলুম। কোন গল্প শোনাবার আর দরকার হয় নি। সেই রাতেই বুড়ো মারা গেলেন।

বাণিজ্য করতে এসে আমরা এক একবার এক একজনকে রেখে ফিরে যাই। কাকে কোথায় রেখে এলুম, সে প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয় বোধে কেউ বড় একটা জিজ্ঞেস করে না। গঙ্গারামের বাবাও করেন নি। করলে আমার মুশকিল হত। আঙ্গি তপ্‌দেনের গল্পটা আমি তাঁকে বলতে পারতুম না।

সকালের বাতাসে তখন উত্তাপের ছোঁয়া লেগেছে। উমেদ সিং একটা বিড়ি ধরালেন। সেটা শেষ করে বললেন ঃ এবারের কেনা-কাটা তো চুকেই গেছে। শুধু শুধু বসে থেকে আর লাভ কী!

আমি উত্তর দিলুম না।

বৃদ্ধ বললেন : চল, কালই আমরা পালিয়ে যাই।

মনে হল, পুরনো ভয়ে এই পালিয়ে যাওয়ার ভাবনা হয়েছে তাঁর। ভাবনারই কথা। আজি তপ্‌দেনেরা তো এককালের নয়, তারা সর্বকালের। এক গঙ্গারামকে হারিয়েছেন যৌবনে, সেই অভিজ্ঞতায় আজ আর একজনকে বাঁচাতে চাইছেন। কথা না বলে আমি তাঁর ব্যবস্থার সমর্থন জানালুম।

আঠার

বিকেলবেলায় আমি উমেদ সিংএর দোকানে বসে টাকা পয়সার হিসেব শিখছি। তিব্বতী আর নেপালী দু রকমের টাকাই এখানে চলে। তার হিসেব জানতে হয় প্রত্যেক বণিককে। নেপালী টাকা আমাদের সাড়ে সাত আনা আর তিব্বতী টাকা সাড়ে চার আনা। এর বেশি দিলেই ঠকবে, শেখাচ্ছিলেন উমেদ সিং।

হঠাৎ সুন্নু আঙমার বাবা ঢুকলেন হাঁপাতে হাঁপাতে। আমাকে দেখতে পেয়েই বসে পড়লেন। কিন্তু আমি তাঁর কথা বুঝি না। উমেদ সিং তাঁর ব্যস্ততার খবর শুনে আমাকে বললেন: এঁরই মেয়ের নাম কি সুন্নু আঙমা? বলছেন, তাঁর মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অনেকক্ষণ থেকে। আর সেই বুড়ো লামাও নেই।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: বলেন কী?

সুন্নু আঙমার বাপ গড়গড় করে অনেক কিছু শোনালেন। উমেদ সিং তার অর্থ বললেন আমাকে। বললেন: কাল থেকেই তিনি লামার মধ্যে একটা দুরভিসন্ধি লক্ষ্য করছিলেন। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে যখনি তিনি তাঁবুতে ফিরেছেন, তখনি দেখছেন লামা তাঁর মেয়ের সঙ্গে ফিস ফিস করে কথা কইছেন। তবে এতটা যে করবেন, তা ভাবতে পারেন নি। গোড়াতে সুন্নু আঙমা তো তাঁকেই পছন্দ করেছিল, কিন্তু তখন তিনি তাকে আমল দেন নি। তাই মেয়ের সঙ্গে ঐ লামাকে দেখে ভাবতেন, বুঝি তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। ওই বুড়োর পেটে যে এত ছিল—

বলে ভদ্রলোক প্রায় কেঁদেই ফেললেন।

উমেদ সিং বললেন: খুব সাংঘাতিক এ দেশের লামা। কে যে সাধু আর কে ভণ্ড, চেহারা দেখে তা কে বুঝবে! সেবারের সেই লামার গল্পটা তোমাকে বলি।

আমি তখন স্নুমু আঙমার কথা ভাবছি। আমাদের বুড়ো লামা যে হঠাৎ এমন কেলেঙ্কারি করে বসবেন, এ কথা ভাবতে পাচ্ছি না। গতকাল থেকে আমিও তাঁকে বিচলিত দেখেছি। তবে সেই চিত্তচাঞ্চল্য যে হঠাৎ এমন ভয়ানক আকার ধারণ করবে, তা কে জানত। আমাদের পরিচয় নিতান্ত অল্প দিনের হলেও সারা দিনমানের সান্নিধ্যে অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। মনে হয়েছিল, আমি একজন স্থিরমতি বুদ্ধিমান জ্ঞানীর সঙ্গে আছি—ভগবানে যাঁর গভীর বিশ্বাস আর মানুষের জন্য যাঁর বুকভরা দরদ। পার্থিব কোন কিছুতে তাঁর লোভ দেখি নি। কাল অন্ধকার পথে ফেরবার সময় তাঁর লোভের সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছেন। ছোট ছোট মঠের মধ্যে ধুলোর ভিতর যে রত্ন অযত্নে পড়ে আছে, তাঁর লোভ সেই রত্ন উদ্ধারের। উমেদ সিংএর গল্প শোনার আগ্রহ তাই হল না। জিজ্ঞাসা করলুম: ওয়াং ডাক আর নিমার তাঁবুটা কি ভাল করে দেখেছেন?

উমেদ সিংএর মারফতে জবাব পেলুম। তাদের তাঁবু তিনি চেনেন না। লামার সঙ্গে মেয়েকে রেখে নিজের ধান্দায় বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে কাউকে দেখছেন না। চাকরেরাও কোন হদিস দিতে পাচ্ছে না।

বললুম: তা হলে ওয়াং ডাকের তাঁবুটাই আগে দেখা যাক। কী জানি, অসুস্থ ওয়াং ডাককে দেখতেই যদি তারা গিয়ে থাকে।

এ কথার উত্তরও পেলুম উমেদ সিংএর কাছে। বললেন: এ ভদ্রলোক বলছেন, স্নুমু আঙমা কিছুতেই তার কাছে যাবে না। ছোট থেকে সে ওই লোকটাকে ঘৃণা করে। জাতেও তো নিচে তাদের।

আমার এ কথা বিশ্বাস হল না। মনে হল, বাপ হয়ে মেয়ের মর্মের কথা তিনি জানতে পারেন নি। জাতের গর্বে অন্ধ হয়ে আছেন।

উমেদ সিংও আমাদের সঙ্গে আসছিলেন। বললুম: আপনি আর এসে কী করবেন! তার চেয়ে বেলা থাকতে গোছগাছটা সেরে নিন। কাল সকালেই তো আমাদের বেরতে হবে।

নিবৃত্ত হয়ে বৃদ্ধ বললেন: রাত্রি একপ্রহর থাকতে আমি বেরতে পারব না। এই বুড়ো হাড় শীতে জমে বরফ হয়ে যাবে। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে সকালের রোদ প্রখর হবার আগেই বেরিয়ে পড়া যাবে।

বললুম: সে মন্দ নয়। বিকেলের দিকে শিলাবৃষ্টি হলে ঝব্বুর বুকের তলায় আশ্রয় নেব। কী বলেন?

হাসতে হাসতে উমেদ সিং তাঁর দোকানে ঢুকলেন।

বিচিত্র অভিজ্ঞতার বুঝি শেষ নেই। নিমাকে তার তাঁবুতে দেখলুম না, দেখলুম না তার বালক স্বামীটিকেও। আরও খানিকটা অগ্রসর হয়ে দেখলুম, তাঁবুসুদ্ধ ওয়াং ডাকও অদৃশ্য হয়েছে। সকালবেলায় শয্যাশায়ী দেখে গেলুম যে লোক, হঠাৎ সে এত শক্তি পেল কোথায়?

ফেরার পথে নিমার একটা চাকরকে দেখতে পেলুম। সেই লোকটা! জিভ বার করে দুটো মুঠো হাত কানের উপর চেপে ঝুপ করে বসে পড়ল। নমস্কারের এও এক রীতি। ইঙ্গিতে তাকে নিমার খবর জিজ্ঞাসা করলুম। হাতের আঙুল দিয়ে মাঠের শেষে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল। দ্রুত পায়ে আমরা সেই দিকেই রওনা হলুম। হঠাৎ পিছনে গানের কলি শুনে দেখলুম, লোকটা দু হাত-পা তুলে মনের আনন্দে নৃত্য করছে।

মনের ভাব প্রকাশ করতে পারলে সুস্থ আঙমার বাপকে একটা আশ্বাস দিতুম। ওই পাগলাটার আচরণে একটা আনন্দের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে নিমার সঙ্গে আরও অনেককে পাওয়া যাবে।

পাওয়াও গেল তাই। একটা তাঁবুর সামনে জনকয়েক পুরুষ আর মেয়ে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছে। নিমা আর তার বালক স্বামীটিকে ছাড়া আর কাউকে আমি চিনি না। আমাদের লামাকে দেখলুম এই বৃত্তের মাঝখানে বসে দু চোখ বন্ধ করে এই নির্মল আনন্দ আকণ্ঠ উপভোগ করছেন।

স্নমু আঙমাকে দেখতে না পেয়ে তার বাপ দাঁড়িয়ে গেলেন। আমিও দাঁড়ালুম।

নিমাকে আজ আর চেনাই যাচ্ছে না। গাঢ় সবুজ রঙের নতুন ছুব্বা পরেছে। বিকেলের রোদ পড়ে ফর্সা মুখখানা ঝকঝক্ করছে আনন্দে। মনে হল না যে কদিন আগেই জঘন্য নোংরা দেখতুম এই মেয়েটাকে।

হঠাৎ চোখ খুলে লামা আমাদের দেখতে পেলেন, আর দেখতে পেয়েই ছেলেমেয়েদের নাচের ফাঁক দিয়ে ছুটে বাইরে এলেন। দু হাত দিয়ে দুজনের হাত ধরে ভিতরে টেনে নিয়ে গেলেন। যারা নাচছিল আর গাইছিল, তাদের বোধ হয় আরও জোরে গাইতে বললেন, বাজা বাজা, ডামনিয়েটা আরও জোরে বাজা।

স্নমু আঙমার বাবার সঙ্গে লামা অনেক কথা কইতে লাগলেন। এমন উচ্ছ্বসিত হতে তাঁকে দেখি নি। খানিকক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকবার পর জিজ্ঞাসা করলুম : আজ কিসের উৎসব এখানে ?

ছ্যু-ছেন ?

লামা হাসতে লাগলেন, জবাব দিলেন না। শুধু উচ্চস্বরে ডাকা-ডাকি করতে লাগলেন।

নিমা যে কখন্ এই নাচের দল থেকে সরে পড়েছিল জানি নে। চাকরের হাতে খাবার দিয়ে পরিবেশন করতে এল। প্রথমেই দিল সিদ্ধ মাংস, তাতে তেল আর মুনও আছে। তার সঙ্গে ছিরিল— বোধ হয় পনির আর চিনির একটা মিষ্টান্ন।

লামা বললেন : ভাত খাবে ? তোমাদের দেশের ভাত ?

বলতে বলতেই বড় থালায় এক এক থালা ভাত এল। তার উপর মাখন, চিনি আর কিশমিশ।

স্নমু আঙমার বাবাও আশ্চর্য হয়েছেন আমারই মতো। অনর্গল কী সব প্রশ্ন করতে লাগলেন। মনটা তার মেয়ের জন্য আকুল হয়ে আছে, খাদ্যে তেমন মন লাগছে বলে মনে হল না।

খাওয়া শেষ হলে নিমা এসে কয়েকটি তিব্বতী টাকা সুন্নু আঙমার বাপের হাতে দিল। হাসতে হাসতে লামা তার অর্থ তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। সুন্নু আঙমার বাপ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তার পরেই ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন।

এমন শক্ত কর্মঠ লোককে এমন শিশুর মতো কাঁদতে কখনও দেখি নি। লামা আমাকে এই কান্নার অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। বললেন: ওয়াং ডাকের সঙ্গে সুন্নু আঙমার বিয়ে দিয়ে দিলুম। ছোট্ট থেকে মেয়েটা ওয়াং ডাককেই ভালবাসে। কিন্তু সামাজিক নিয়মের জন্যে সে কথা কোনদিন প্রকাশ করতে পারে নি। কাল পর্যন্ত আমি জানতুম, ওরা এক জাতের। তাই সুন্নু আঙমার বাপের আচরণে আমাব কেমন খটকা লাগত। কী পরিশ্রম করেছি এই দুটো দিন। শেষ পর্যন্ত সুন্নু আঙমাই আমাকে সত্য কথাটা জানিয়ে দিল। বলল, ওরা টংডু, ওর সঙ্গে তো তার বিয়ে হতে পারে না। আমি এদের সামাজিক অহঙ্কারের কথা জানি। দারিদ্র্যের চরমে নেমে গেলেও একজন টংবা বাপ কোন বর্ধিষ্ণু টংডু ছেলের হাতে তার মেয়ে দেবে না। অথচ ভেবে দেখবে না, কিসেব এই জাতিভেদ? কোন এক অজ্ঞাত যুগে এই বর্ণ বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কী কারণে হয়েছিল তা আজ সবাই ভুলে গেছে। আজ এই জাতিভেদ শুধু দলাদলিই সৃষ্টি করছে, একটা বলিষ্ঠ জাতির গঠনে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

একটু থেমে বললেন: তুমি ভাবছ, সুন্নু আঙমার বাপ কাঁদছেন তাঁর এই জাতের অহঙ্কার ভেঙে গেল বলে। কিন্তু তা নয়। তিনি কাঁদছেন নুবিন হাতে নিয়ে। বুকের দুধ দিয়ে মেয়েকে লালন করেছেন বলে মেয়ের মাকে কিছু টাকা ধরে দেওয়া হয় ঋণ-শোধের জন্যে। পাত্রপক্ষের দেওয়া এই টাকাকে নুরিন বলে। সুন্নু আঙমার মা আজ বেঁচে নেই। সেই কথা ভেবে অমন করে কাঁদছে।

আশ্চর্য ক্ষমতা এই লামার। মনে হল, আমাদের অন্তরটা যেন দেখতে পাচ্ছেন অন্তর্যামীর মতো।

লামা বললেন : নিমার সাহায্য না পেলে এসব কিছুই সম্ভব হত না। সে-ই সমস্ত ভার নিয়ে এই বিয়ে দিল। সকাল থেকে আজ সে এই সব ব্যবস্থাই করেছে।

জিজ্ঞাসা করলুম : এই রঙ-বেরঙের পোষাক পরে এরা নাচছে, এদের তো আগে দেখি নি।

লামা হেসে বললেন : এরা ওয়াং ডাকের দেশের লোক। এরাও ব্যবসা করতে এখানে এসেছিল। ওয়াং ডাকের চাকর এদের নেমন্তন্ন করে এনেছে।

এক জায়গায় ভিখারীরা বসেছিল গোল হয়ে। নিমা তাদেরও খেতে দিয়েছে। গোগ্রাসে তারা গিলে যাচ্ছে। জন দুই বহুরূপী নেচে নেচে গান গাইছে, আর শুকনো মাংস চিবোচ্ছে।

লামা বললেন : বর-কনে দেখবে না ?

সত্যিই তো, এই সব হৈ-চৈ-এর ভিতর আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছিলুম। যার জন্য এত খাওয়াদাওয়া, এত হৈ-হুল্লোড়, তাদের কথাই যে এতক্ষণ মনে হয় নি।

সুমু আওমার বাপও খানিকটা শান্ত হয়ে এসেছিলেন। সবাই মিলে তাঁবুর ভিতর গেলুম।

ওয়াং ডাক শুয়েছিল। মাথার চুল আঁচড়ে লোকটা টুপি পরেছে আজ। চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে লামা বললেন : নিমাই আজ সব কিছু করেছে।

নতুন জামা-কাপড় পরে ওয়াং ডাকের পাশে বসে আছে সুমু আওমা। আজ তার মাথার চুল পরিপাটি করে বাঁধা। তাতে পুঁতির আর পাথরের মালা। মাঝখানে একটি মস্ত প্রবাল ঝকমক করছে। মুখে আর সেই রঙের প্রলেপ দেখলুম না, সেই নোংরামি নেই।

আমার বিস্মিত দৃষ্টি দেখে লামা বললেন : আজ সকালবেলাতেই একখানা সাবান কিনেছিল নিমা। আমার কাছে তার ব্যবহার শিখে প্রথমে নিজে ঘষেছে, তার পর ধরেছিল এই মেয়েটাকে। এ মেয়েটা

কিছুতেই রাজী হবে না, কেঁদেই আকুল। এ জানে, মুখের নোংরামি ঘষে তুললেই তার কপাল ভাঙবে। সুমু আঙমা তার বিয়ের পরে সাবান ঘষেছে।

বাপের মুখে মুখ লুকিয়ে সুমু আঙমা তখন গভীর ভাবে কাঁদছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : বিয়ের অনুষ্ঠান করলেন কারা?

লামা হেসে বললেন : অনুষ্ঠানের ত্রুটি কিছুই হয় নি। লাল টুপির লামাকে খরচ দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাঁদের মঠে এই পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করেছেন। এখানে এসেছিলেন একজন পন-পো পুরোহিত। তিনি লুইগ্যালপোর পূজো করলেন। এই দেবতা প্রত্যেক পরিবারের সুখসমৃদ্ধি রক্ষা করেন, তাই সমস্ত অনুষ্ঠানে তাঁর পূজো সকলের আগে করতে হবে।

মেয়ের সঙ্গে কান্নাকাটির পর্ব শেষ করে সুমু আঙমার বাবা তখন ওয়াং ডাকের সঙ্গে কথা কইতে শুরু করেছেন। লামা বললেন : অদ্ভুত মন এই ছেলেটার। এই বিয়েতে কিছুতেই তাকে রাজী করাতে পারছিলুম না। জীবনে বিয়েই করবে না বলে জেদ ধরেছিল। সুমু আঙমার সব কথা তাকে খুলে বললুম। শুধুমাত্র সামাজিক বাধার জন্যে নিজের অন্তরের আবেদন কাউকে জানাতে পারে নি। ভেবেছিল, এ সত্য প্রকাশ হয়ে পড়লে সমাজে তার বাপ মুখ দেখাতে পারবে না। তাই সে সাধারণ লোক বিয়ে করবে না বলে চেঁচামেচি করত। কোন লামার প্রতি কখনও তার আকর্ষণ ছিল না, ছিল তার মনোবিকারের পরিচয়। নিজের দয়িতকে কোনদিন পাবে না জেনে ধর্মের ভেতর খানিকটা সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করত। গোড়া থেকেই আমি তাকে একটু সন্দেহের চোখে দেখেছি, সেই সন্দেহই আমার সত্য বলে ধরা পড়ল কাল সন্ধ্যায়।

তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে : লামা বললেন : সুমু আঙমা নিজে যেচে সেই ছোকরা লামাকে তাদের সমস্ত অর্থ দিয়েছে। কেন দিয়েছে শুনলে আরও আশ্চর্য হবে। কোনও মঠে প্রচুর অর্থ দান করলে

ওয়াং ডাক জাতে উঠবে, এই ভরসা দিয়েছিল সেই ছোকরা লামা। টাকা নিয়ে বলে গেছে রেতাপুরীর মঠাধ্যক্ষের কাছ থেকে সেই সনদ এনে দেবে। সুন্নু আঙমার কাছে লোকটা শুধু অর্থই পেয়েছে, আর কিছু পায় নি।

একটু থেমে বললেন ঃ ওয়াং ডাক এ কথা বিশ্বাস করতে রাজী হয় নি। তবু বলেছিল, তার যা কিছু আছে সব ওদের দিয়ে দিতে। ও সবে তার আর এতটুকু লোভ নেই। মনে হল ঘটকালিতে বুঝি হেরে গেলুম। এক সময় সুন্নু আঙমার বাপের কথা ওয়াং ডাক জিজ্ঞেস করল, বলল, তাঁর কী মত ? বললুম, তাঁর এত ভাববার সময় কই ? দেশে ফিরে যাবার রসদ তাঁর শেষ হয়ে গেছে, ধারের চেষ্টায় এর ওর কাছে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। ওয়াং ডাক বলল, আমি এখানে আছি, আমাকে তো বলতে পারতেন তাঁর বিপদের কথা। বললুম, সে কথা বলবার কি তাঁর মুখ আছে। আর একজন অনাত্মীয়ের কাছে সাহায্যই বা নেবেন কেন! এ কথার জবাব পেলুম আজ সকালে। ভোরবেলাতেই ওয়াং ডাক আমাকে ঠেলে তুলল। বলল, সুন্নু আঙমাকে সে বিয়ে করবে।

নির্মল আনন্দে লামার মুখখানা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন ঃ তুমি ভাবছ, সুন্নু আঙমার জন্যেই ওয়াং ডাক তাকে বিয়ে করতে রাজী হল। এ তোমার ভুল। সুন্নু আঙমার বাপের জন্যে এ বিয়েতে সে রাজী হয়েছে। এই দুঃস্থ পরিবারকে অসহায় ফেলে যাবে, ওয়াং ডাক এমন অমানুষ নয়।

হেসে বললেন ঃ এবারে সুন্নু আঙমার পরীক্ষা শুরু হল। একান্ত সেবা দিয়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ দিয়ে স্বামীর মন জয়ের অভিযান করতে হবে তাকে। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আজকের এই দিনটি আমার অক্ষয় হয়ে রইল। মানুষে মানুষে পার্থক্য থাক্— বুদ্ধের শিক্ষা এ'নয়। মানুষ আপনার ক্ষুদ্রতা দিয়ে সংকীর্ণতা দিয়ে যুগে যুগে দেশে দেশে এই সব গণ্ডির ভেতর গণ্ডি রচনা করেছে। সে

ভুল বোঝবার, সে ভুল ভাঙবার দিন এসেছে আজ। যতই সামান্য হোক, আমার সাফল্যে আজ আমি আত্মপ্রসাদ পাচ্ছি। একটুখানি খোঁচা তবু রইল। এই যে যারা বাইরে অমন গাইছে আর ঘুরে ঘুরে নাচছে, তারা সবাই জাতে টংড়ু। টংবারা এগিয়ে এসে যোগ দিল না। কিন্তু আমি জানি, একদিন তারাও যোগ দেবে। সেদিন আসতে আর বেশি দেরি নেই। বুদ্ধ আজও বেঁচে আছেন তো—আমার বিশ্বাস কখন মিথ্যা হবে না। বলেই সুর করে গাইলেন.ঃ

সাঙ্গে লা ছিব গিউ নাঙ্গো
টাশী ডিলে ফুন্ সুম্ ছোগ্।

উনিশ

দিনের আলো তখনও একেবারে নিবে যায় নি। নিমার তাঁবুর সামনে বসে পরিষ্কার ঝকঝকে বাটিতে স্সুজা খাচ্ছি। ছাংএ প্রবৃত্তি নেই, তাই স্সুজাই একটু বেশি খাই। বেশ লাগছিল খেতে। হঠাৎ মনে এল যে নিমার হাতে তৈরি স্সুজার বোধ হয় এইটিই শেষ বাটি।

লামাও হয়তো ঠিক এই কথাই ভাবছিলেন, বললেন: কাল আমাদের ছাড়াছাড়ি।

একটু থেমে আবার বললেন: কালই তোমার যাওয়া ঠিক হয়ে গেল, তাই না?

অন্যমনস্ক ভাবে সমর্থন জানালুম।

লামা বললেন: ভেবেছিলুম, তোমার কাছে আমার পরিচয় গোপন করেই রাখব, কিন্তু সে সংকল্প আমার ভেঙে যাচ্ছে। বোধ হয় মনে আছে, প্রথম আলাপের সময় তোমায় আমি চীনের লামা বলে পরিচয় দিয়েছিলুম। মিথ্যে বলি নি। আমার জন্ম চীন দেশেই। কিন্তু আমি চীনা নই। লাসায় আমার বাবা ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ ছিলেন। একবার সাধারণ লোকের ভেতর শিক্ষার বিস্তারের জন্যে একটা খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করে রাজপরিষদে দাখিল করেছিলেন। এটা তাঁর অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হল ও তাঁর শাস্তির বিধানের জন্য নেচুং মঠের লামাদের সংবাদ দেওয়া হল। মঠাধ্যক্ষদের ঘুষ দিয়ে হাত করবার চেষ্টা না করে বাবা তার কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় চীনে পালিয়ে গেলেন। সোজা পথে ধরা পড়বার সম্ভাবনা ছিল বলে, অনেক দুর্গম গিরিকন্দর পেরিয়ে তিনি চীনে প্রবেশ করেন। আমার মা সেই পথের কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না, কোনও এক অজ্ঞাত অখ্যাত পাহাড়ে তাঁর সমাধি হল।

তখনও আমার জন্ম হয় নি। আমি আমার বাবার চীনা পত্নীর

সন্তান। আমার শিক্ষা-দীক্ষা সবই হয়েছে চীন দেশে। তাই যখন আমি আমাকে চীনা লামা বলে পরিচয় দেই, তখন আমি মিথ্যা বলছি বলে আমার মনে হয় না। এখন আমি লাসায় থাকি, লাসার একটা মঠে। লাসায় কেন ফিরে এলুম, তাও তোমাকে বলি। মারা যাবার আগে আমার বাবা আমাকে অনুরোধ করে গেছেন যে, প্রাণের ভয়ে যে কাজ তিনি শুরু করতে পারেন নি, সেই কাজই যেন আমার ব্রত হয়। তিব্বতকে তিনি ভালবাসতেন। কত বিনিদ্র রজনী তিনি তাঁর অক্ষমতার জন্যে চোখের জল ফেলে কাটিয়েছেন, আমি তার খানিকটা আমার মায়ের কাছে শুনেছি। আজ আমার মাও আর বেঁচে নেই, এই পৃথিবীতে আমি সম্পূর্ণ একা। আর এই জন্যেই আমি লামার পোষাক পরে নিজেকে লামা বলে প্রচার করি। তাতে অন্য লাভ না হোক, প্রাণটা সহজে দস্যুর হাতে দিতে হবে না।

আমার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্যও আজ তোমার কাছে গোপন রাখব না। লাসায় আজ আমি আমার বাবার মতো একা নই। এখন আমার অনেক সঙ্গী। সবাই আজ তিব্বতের জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে ভাবছেন। লিখে বক্তৃতা দিয়ে মত প্রকাশ করবার সাহস নেই কারও। তাই আমরা দিকে দিকে বেরিয়ে পড়ে গ্রামে গ্রামে পাহাড়ে ঘুরে নতুন জন্মের জন্যে ক্ষেত্র রচনা করছি। সশস্ত্র বিপ্লব দিয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করা যায়, কিন্তু সংস্কারমুক্ত করা যায় না। তিব্বত আজ সংস্কারে অন্ধ হয়ে আছে। বুকের উত্তাপ দিয়ে তার চোখ ফোটাবার দায়িত্ব আমরা নিয়েছি।

লামা কথা কইলেন না অনেকক্ষণ। আমারও বলবার কিছু নেই। সাদা তাঁবুর ধূসর ছায়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে অন্ধকারে একাকার হয়ে গেছে। ওধারের একটা তাঁবু থেকে হাপরে আগুন ওসকাবার শব্দ আসছে।

একসময় আবার তিনি কথা কইলেন, বললেন: এদের সঙ্গে আমারও যাত্রা প্রায় শেষ হয়ে এল।

ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলুম: আপনি কি লাসায় এখন ফিরবেন না?

সেই প্রশান্ত হাসিতে আবার উজ্জ্বল হল লামার মুখ। বললেন: ফিরব বলে তো বের হই নি বন্ধু। নিজের কাজ সম্পূর্ণ করে যেতে পারলেই জীবন সার্থক হয়েছে মনে করব।

প্রশ্ন করলুম: কোথায় যাবেন এখান থেকে?

লামা বললেন: রেতাপুরী, সেখান থেকে কৈলাস। তিব্বতের মানচিত্রে দেখেছি ছো মাফাম্ থেকে বেরিয়েছে চারটি প্রধান নদী। কর্ণালী, জাঙপো, শতদ্রু আর সিন্ধু। কর্ণালী নেপালের নদী, জাঙপো শিগাৎসের উত্তরে আর লাসার দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে ব্রহ্মপুত্র নামে। রেতাপুরী থেকে শতদ্রুর উপত্যকা পাওয়া যায়। কিন্তু আমাকে সিন্ধুর পথ নিতে হবে। আমি গারথক হয়ে যদি পারি একবার হিমিশ গোম্ফা দেখে ফিরব। বোধ হয় জান, তের বৎসর বয়সে যীশুখ্রীষ্ট একদল বণিকের সঙ্গে ভারতে আসেন। ভারতে তিনি ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের কাছে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে হিমালয় পেরিয়ে পশ্চিমে ফিরে যান। বাইবেলে যীশুর জীবনের যে আঠার বছরের কাহিনী অজ্ঞাত, অনেকে অনুমান করেন, যীশু এই কয় বৎসর ভারতের নানা স্থানে সকল ধর্মমতের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করছিলেন। শুনলে আশ্চর্য হবে যে লাদাকের এই হিমিশ গোম্ফায় যীশুর অজ্ঞাত জীবনের ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন ডক্টর নিকোলাস নটোভিচ নামে এক রুশ পর্যটক। মারবুর মঠে যে মূল গ্রন্থ পাওয়া গেছে, তা পালি ভাষায় লেখা। হিমিশ মঠে তিব্বতী অনুবাদ আছে বলে শুনেছি।

মনে পড়ল, স্বামী অভেদানন্দ হিমিশ গোম্ফা পরিদর্শনের সময় এই পুঁথির স্থানবিশেষ অনুবাদ করে এনেছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ পুঁথিখানির সংবাদ আমরা রাখি না। যীশুর এই অজ্ঞাত জীবনের ইতিহাস উদ্ধারের জন্য খ্রীষ্টানরা কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তাও আমার জানা নেই।

মনে হল, লামা তাঁর এই হিমিশ অভিযানের বাসনা জানিয়ে সমস্ত ভারতবাসী ও খ্রীষ্টান জাতির লজ্জিত হবার কারণ ঘটালেন।

আমি কী বলব ভাবছিলুম। এমন সময় আড়ালে একটা সোরগোল উঠল। তার কারণ জানবার জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ছেরিং পেনছো ফিরে এসেছে। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে ওয়াং ডাকের ঘোড়া থেকে টুপ করে নেমে পড়ল। নিমা তার তাঁবুর ভিতর গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিল, সোরগোল শুনে সেও বেরিয়ে এসেছিল। তার স্বামীকে হঠাৎ এমন অবস্থায় দেখবে আশা করে নি, দৃষ্টিতে কেমন বিহ্বলতা ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল তাকে সাহায্য করতে।

আমরা তার খবর শোনবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলুম। সেও ব্যস্ত হবার মতো খবর এনেছে দেখলুম। সব শুনে লামা আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। বললেন: ছোকরা লামার হদিস পাওয়া গেল না। রেতাপুরীর মঠে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কী একটা উৎসবে কয়েক শো লামা একত্র হয়েছিলেন। কিন্তু সে ছোকরা পথে না হেঁটে নিশ্চয় উল্টো দিকে গেছে। কৈলাসের দিকে গেছে কিনা তাও দেখে এসেছে। পরিক্রমার রাস্তার কোনখানে কোন মঠে তার সন্ধান পাওয়া গেল না। মাঝে থেকে তার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। থারচেনের ওপর একটা গোম্পার ভিতর জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। তাই দেখে সে ছুটে আসছে। আজ আমাদের খুঁজে না পেলে কাল গ্যানিমার পথে রওনা হত।

লামা সব কর্তব্য নির্ধারণ করে দিলেন। ছেরিং পেনছো এখন খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করবে। যাত্রা শুরু হবে রাত্রি এক প্রহর থাকতে। রেতাপুরীর পথে নয়, সোজা মানস সরোবরের দিকে। পা চালিয়ে হাঁটলে বিকেলের দিকেই পৌঁছনো যাবে।

তার স্বামীর বিশ্রামের ব্যবস্থার জন্য নিমা আবার ভিতরে গেল। লামা বললেন: তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলে তোমাকে ছুত্তেন ফুক মঠে নিয়ে যেতুম। ছুত্তেন ফুক মানে অলৌকিক ঘটনার গুহা।

বিখ্যাত মুনি জেসু মিলারেপা এই মঠ স্থাপন করেন। শুধু তীর্থযাত্রীর কাছে নয়, সমস্ত শিক্ষিত তিব্বতীর কাছে মিলারেপা আজও বেঁচে আছেন। তাঁর অপূর্ব কাব্য তাঁকে যুগ যুগ বাঁচিয়ে রাখবে। তিব্বতী সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বিদেশী সাহিত্যে আমার অনুরাগের অন্ত নেই। কিন্তু মিলারেপার কবিখ্যাতি আমার অজ্ঞাত। কখন কারও কাছে এঁর নাম শুনেছি বলেও মনে হল না।

আমার এই সন্দেহের কথা শুনে লামা বললেন: পৃথিবীর নানা ভাষায় না হোক, কয়েকটি ভাষায় যে এঁর কবিতার অনুবাদ হয়েছে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। বইএর নাম আমি বলতে পারছি নে, কিন্তু দেশে ফিরে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করলেই জানতে পাবে।

তোমাকে আরও একটি জিনিস দেখাতে পারতুম। সে তিব্বতী শিল্পপ্রীতি। এমন মঠ নেই যার ছাদ আর দেওয়ালে নেই অপূর্ব ফ্রেস্কো। প্রত্যেকটি পতাকা দেখবে বিচিত্র চিত্রশোভিত, এগুলিকে আমরা থাঙ্কা বলি। রূপো আর পেতলের সমস্ত বাসন দেখবে চিত্র-ক্ষোদিত। কিন্তু এই শিল্প একাগ্র ভাবে ধর্ম-প্রণোদিত। বুদ্ধ আর বৌদ্ধ মহিমা বাদ দিয়ে তাই তিব্বতের শিল্প হল না। শুনে আশ্চর্য হবে, এখানকার শিল্পীরা ছাগল বা বেড়ালের লোম থেকে নিজেরাই তাদের তুলি তৈরি করে। তেমনই পাথর মাটি আর গাছ গাছড়া থেকে তৈরি করে নানান রকমের রঙ। ছবি আঁকার শিক্ষাও তারা পায়। বুদ্ধের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাপের নক্‌শা দেওয়া থাকে ধর্মপুস্তকের ভেতর। লামা তাঁর শিল্পী ছাত্রকে দিয়ে এমন ভাবে মক্‌শ করাবে সেই মাপগুলি যে সারাজীবনেও তা আর ভুল হবে না। অন্য ছবি আঁকবার কারও অধিকার নেই। গুরুর কাছে আর একটা জিনিস এরা শেখে, সেটা হচ্ছে অনুভূতি দিয়ে ছবি আঁকা। চোখ দুটো মনের জানলা হতে পারে, কিন্তু মনই হচ্ছে সত্যিকার শিল্পী। তিব্বতে ছবি আঁকে শিল্পীর শান্ত সমাহিত মন

অন্ধকার তখন বেশ ঘনিয়ে এসেছে। দূরের মানুষ আর চেনা যাচ্ছে না। তাঁবুর ভিতর প্রদীপ জ্বেলেছে নিমা। সেই আলোর শিখা মনে হচ্ছে আজ থরথর করে কাঁপছে।

লামা বললেনঃ তুমি কি আজ রাতেই উমেদ সিংএর তাঁবুতে চলে যাবে?

না। কাল সকালে যাবার কথা বলে এসেছি।

এখন তো দেখছি এরাই আগে যাত্রা করবে।

সেই বা মন্দ কি! কাল আপনাদের যাত্রা করিয়ে দিয়ে ফেরার কথা ভাবব।

ওয়াং ডাকেরা কাল যাত্রা করতে পারবে কিনা সে খবরটা নিয়ে আসা দরকার। তুমি একটু একা বসবে কি?

হাঁটবার ইচ্ছে ছিল না, তাই সম্মতি জানিয়ে বসে রইলুম। লামা একবার তাঁবুর ভিতর উঁকি দিয়ে নিমাকে কী একটা বললেন, তারপর তাঁর লাঠিগাছটা তুলে নিয়ে রওনা হলেন। বলে গেলেন ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরা না গেলে ঘোড়াটা তো ফেরত দিতে হবে।

ঘোড়া ওয়াং ডাকের, কিন্তু ক্লান্ত ছেরিং পেনছোর সে কথা মনে নেই। লামার মনে আছে। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি সংসারী।

হাওয়ায় হিম ঘনিয়ে উঠেছে। থেকে থেকে কেঁপে উঠছি, তাঁবুর ভিতরে যেতে তবু ইচ্ছে হল না। এক সময় একটা ছায়া দুলে উঠল। পাশ ফিরে চেয়ে দেখলুম, নিমা বেরিয়ে এসেছে। কোন কথা না বলে আমার পাশে এসে বসে পড়ল।

উপরে নির্মেঘ নীল আকাশ নির্বিকার চেয়ে আছে। চাঁদ বুঝি ওঠে নি এখনও, কিংবা ডুবে গেছে। তারায় আজ জ্যোতি নেই, শূন্য ফ্যাকাশে দৃষ্টি মেলে শুধু প্রহর গণনা করছে।

নিমা কথা কইল না। কইবেই বা কী! আর বললেও বোঝবার লোক এখানে কোথায়? আমি তার মুখের দিকে চেয়ে ওই থমথমে আকাশটারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলুম। অমনই ফ্যাকাশে স্থির দৃষ্টি,

জ্যোতিহীন, তবু সুন্দর। আন্তরিক সেবায় আর যত্নে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে আমায় ফিরিয়ে এনেছে যে স্নেহময়ী নারী, আজ রাত্রি-শেষে তাকে বিদায় দিতে হবে। বেদনার্ত বিদায়। জীবনে আর কখনও দেখা হবে না, কোনও খবর নেওয়া যাবে না, দেওয়া যাবে না। এমনই কঠিন বিদায়—মৃত্যুর মতো নিষ্ঠুর। মনে হবে, অন্য কোনও গ্রহে দেখা হয়েছিল, অন্য কোনও আকাশের তলায়। সে গ্রহ আমাদের হারিয়ে গেছে অন্ধকারে, সে আকাশ মিলিয়ে গেছে স্বপ্নের মতন। ধোঁয়ার মতো ধূসর মেঘ ভেসে যাচ্ছে তাঁবুগুলোর পিছন দিয়ে। মনে হল, অমনই ধোঁয়া বুঝি বুকের ভিতর ঠেলে উঠেছে গলা পর্যন্ত। নিমা স্থির হয়ে বসে রইল। তার দেহে যেন প্রাণ নেই। লামার মুখে তাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। শুধু কৃতজ্ঞতা। যা পেয়েছি তার একটা ভদ্র দাম। আজ এই অন্ধকারের ভিতর পাশাপাশি বসে মনে হল, ওই কৃতজ্ঞতাটুকু না জানালেই বোধ হয় ভাল হত। দাম দেওয়ার নাম করে অপমান কবার দায় থেকে তা হলে মুক্তি পেতুম।

এ কি, তার গালের উপর ও কী চকচক করছে? চোখের জল, না আমি আমার মনের ছায়া দেখছি তার মুখের উপর? হঠাৎ বুঝি অবশ হয়ে এল সারা শরীর। মনে হল, দেহটা যেন আর আমার নিজেব বশে নয়।

জানি না কতক্ষণ এমন করে বসেছিলুম। চমক ভাঙল লামার কণ্ঠস্বরে। বললেন: কী আশ্চর্য! এই কনকনে ঠাণ্ডার ভেতর তোমরা এখনও বাইরে বসে আছ?

সত্যিই তো! শীতে যে হিম হয়ে গেছে দেহটা।

কোনও কথা না বলে নিমা তাঁবুর ভিতর উঠে গেল। আমি অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে বললুম: আপনারই অপেক্ষা করছিলুম।

লামা বললেন: আমার যাওয়া তো হল না ভাই। ওয়াং ডাকের

আবার জ্বর এসেছে। আমাকে এখন ওর সঙ্গেই থাকতে হবে। কিছুতেই ওরা ছাড়তে চাইল না।

নিমাকে চেঁচিয়ে ডাকলেন। কাছে এলে বুঝিয়ে বললেন ঘটনাটা।

একটা চাকরকে নিমা কী নির্দেশ দিল। সে লোকটা ওয়াং ডাকের ঘোড়াটা ধরে আনল। তাঁবুর ভিতর থেকে লামাও তাঁর ঝোলাঝুলি সংগ্রহ করে আনলেন। বললেন: কাল যাবার আগে দেখা করে যেও। আমি তোমার অপেক্ষা করব।

নিঃশব্দে সেই প্রতিশ্রুতি দিলুম।

নিমা ঝুপ করে লামার পায়ের উপর বসে পড়ল। হাত দুটো দেখলুম তার কানের উপরে চেপে ধরেছে। লামা গভীরভাবে তাঁর দুটো হাত মেয়েটার মাথার উপর রাখলেন। তারপর তাকে টেনে তুললেন। কী আশীর্বাদ করলেন বুঝতে পারলুম না। চাকরটাকে এগিয়ে চলার নির্দেশ দিয়ে বলে গেলেন: বুদ্ধ তোমাদের আশীর্বাদ করুন।

নিজে কোনও আশীর্বাদ করলেন না।

কেন জানি না, আমার মনে পড়ল সেই গানের কলিটি:

সাঙ্গে লা ছিব গিউ নাঙ্গো।
টাশী ডিলে ফুন্ সুম্ ছোগ্।

হে বুদ্ধদেব, অপার তোমার মহিমা, আবার তুমি আমাদের ভিতর ফিরে এস। তিনি কি আসেন নি?

কুড়ি

হংসয়োর্দম্পতি পূর্বং মানসাখ্যে সরোবরে।
স্থিতৌ পরস্পরং প্রেম্না বিহরন্তৌ নিরন্তরম্॥
কুবেরস্তত্র বৈ নিত্যং বিহর্তুং যাতি সাবলঃ।
চিরং বিহৃত্য সংস্নায় বটমূলে সমাশ্রয়ৎ॥

কুবের কোন কালে ভারতের আরাধ্য দেবতা ছিলেন না। যুগ-যুগান্ত ধরে ত্যাগের শিক্ষা পেয়েছে যে দেশ, ঐশ্বর্যে বিরাগ তার রক্তে ও মজ্জায়। কুবের তাই ভারতের সীমানা পাহাড় ডিঙিয়ে এই মানসের তীরে তাঁর পুরী নির্মাণ করেছিলেন। সকাল সন্ধ্যায় তাঁর পুর-ললনারা স্নান ও প্রসাধনের জন্য নেমে আসতেন এই সরোবর তটে। তাঁদের চঞ্চল চরণে স্বর্ণ-নূপুরের নিক্কণ উঠত মন্দিরার মতো। পরিধেয় পট্টবস্ত্রের বর্ণাঢ্যে রামধনুর ছায়া পড়ত মানসের নীল জলে। আর তাঁদের হীরকাভরণ থেকে বিচ্ছুরিত হত মধ্যাহ্ন-সূর্যের বিচিত্র দ্যুতি।

আবেগোচ্ছল হংসমিথুন কেলি করত সেই শান্ত সুনীল জলরাশির উপর। তাদের পক্ষপুটে বিক্ষুব্ধ সলিল তরঙ্গ বিক্ষেপ করত বলয়ের মতো। সেই তরঙ্গ মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে স্নানার্থিনীদের নিরাবরণ বক্ষে এসে আঘাত করত। কঙ্কণ-বলয়-শিঞ্জিত লীলায়িত বাহুর তাড়নায় তরঙ্গের নৃত্য উঠত তটপ্রান্তে।

সেখানে স্নিগ্ধ ছায়া .বিস্তার করে আছে বৃদ্ধ বট, নির্বাক প্রহরীর মতো তার দিবারাত্রির সতর্ক প্রহরা। স্নান সমাপনান্তে কুবের কন্যারা এসে প্রসাধন করত এই বটের ছায়ায়। যেখানে সূর্যকিরণ এসে মৃত্তিকা স্পর্শ করে, সেই উত্তাপে ঘনকৃষ্ণ কেশদাম মেলে দিত কেশবতী কন্যা, আর যৌবনভারগর্বিতা নারী তার বেশবিন্যাস করত ঝুরির আড়ালে দাঁড়িয়ে।

আজ আর মানসতটে সে বটগাছ নেই। কুবের-ললনাদের কল-

হাস্তে মুখর হয়ে উঠে না তার তীরভূমি। হংসমিথুনও হারিয়ে গেছে। তাদের কলকাকলিতে মানসের বাতাস আর উচ্চকিত হয়ে উঠে না। কুবের আজ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছেন। তাঁর নতুন পুরী রচনা করেছেন দেশান্তরে। যে ভারত একদিন তাঁকে চায় নি তার আদর্শে, সে ভারতকে তিনি চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করে গেছেন। ভুখা ভারত আজ ক্ষুধায় কাঁদে।

কিন্তু ভারতের আদর্শ আজও মরে নি। সেই সর্বত্যাগী ভোলা মহেশ্বর আজও তপস্যারত তাঁর তুষারমণ্ডিত শৈলশিখরে। কৈলাস আজও জেগে আছে।

> গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিত প্রস্থসন্ধেঃ
> কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
> শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
> রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ॥

কুবেরবিজয়ী রাবণ একদিন বাধা পেয়েছিলেন এই কৈলাস পর্বতে। পুষ্পক রথ থেকে অবতরণ করে ক্রোধান্ধ রাক্ষস সেদিন তাঁর বিশ হাতে এই পর্বতকে পৃথিবী থেকে উৎপাটিত করতে চাইলেন। কিন্তু লীলা-ময় মহাদেবের পায়ের চাপে নিপীড়িত হয়ে তাঁর অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল। তারপর এই মানসের তটে সহস্র বর্ষ তপস্যা করেছিলেন সেই উদ্ধত রাক্ষস। তাঁর দেহের ঘর্মে কিংবা তাঁর অশ্রুধারায় সৃষ্টি হয়েছিল রাবণ হ্রদ।

ভারত থেকে তীর্থযাত্রীর দল এই দুই হ্রদের মাঝখান দিয়ে চলেছে কৈলাস দর্শনে। যুগ যুগান্ত ধরে চলেছে এই যাত্রীদল। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর টানে চলেছে পুণ্যাতুর মানব-শিশু।

আর আমি—

কিছুতেই আজ ঘুম আসছে না। গ্যাকার্কোর বাজারে কি আজ হিমের কণা ফুরিয়ে গেছে। না, নিমার টুকটুক খানাতেই আজ আগুন লেগেছে অতর্কিতে।

কবি কালিদাসের স্বপ্নের দেশ আর মাত্র একটি দিনের পথ। সে পথ আমার অতিক্রম করা হল না। প্রাণের ভয়ে আমি আমার দেশে ফিরে চলেছি। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে বড় গলায় বলব, আমি বেঁচে আছি। সিঁড়িটা হারিয়ে যাবার ভয়ে স্বর্গের সিংহদ্বার ছুঁয়েই নেমে এসেছি।

ও কাকে দেখতে পাচ্ছি? উজ্জ্বল আলোর নিচে বসে একটা চেনা মেয়ে যেন কী একটা বই পড়ছে। ওটা প্রথম ভাগ নয়? কী পড়ছে মেয়েটা? পাখার বাতাসে তার শাড়ির আঁচল দুলছে। আলো ঠিকরে বেরচ্ছে তার কানের ফুল থেকে। পাশ থেকে তাকে ঠিক চিনতে পাচ্ছি না। মুখটা ফেরালেই চিনতে পারব। ও কি! তার গালের উপর মুক্তোর মত কী যেন চকচক করছে! চোখের জল নাকি! আলোটা কে নিবিয়ে দিল? তার গভীর নিঃশ্বাস যে এখন আমার গায়ে লাগছে! সন্ধ্যেবেলায় গায়ের কাছে বসে এমনই করেই নিঃশ্বাস ফেলছিল সেই তিব্বতী মেয়েটা!

স্বপ্ন আর স্বপ্ন! জেগে জেগে এত স্বপ্ন আর দেখতে পারি নে।

রাত কত হল? এখনও কি এক প্রহরের বেশি বাকি আছে? এত ঘুমোয় কী করে মানুষগুলো!

গায়ের টুকটুকখানা ফেলে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলুম। গভীর ঘুমে সমস্ত মণ্ডিটা তখন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। নীল আকাশে চাঁদের আলোর বান ডেকেছে, আকাশে লেগেছে মদের নেশা।

অন্ধকারে নিমাকে দেখলুম ছায়ামূর্তির মতো বসে আছে। তার চোখেও কি আজ ঘুম নেই! ঘুমোবেই বা কী করে! যার অসুস্থ স্বামী একটা অজ্ঞাত জায়গায় অচেতন হয়ে পড়ে আছে, তার স্ত্রীর চোখে যে ঘুম নামবে না, সেই তো স্বাভাবিক। কথা না বলে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। নিমা আপত্তি করল না।

ধোঁয়ার ভিতর দিয়েও আকাশের আলো এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। নিমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম। কী অভাবনীয় পরি-

বর্তন এসেছে তার বাইরেটায়। নতুন পোশাকটা তার গা থেকে খুলে ফেলে নি, তার পরিচ্ছন্ন সবুজ ছায়া পড়েছে তার নির্মল মুখে। ঘাড়ের কাছে ময়লা আর থিকথিক করছে না, মুখের সেই রক্ত-নির্যাসও ঘষে ঘষে ধুয়ে ফেলেছে। মাথার চুলেও বুঝি তেল জল পড়েছে। লম্বা বেণী পরিপাটি করে বাঁধা, তার উপর শামুক আর কড়ির মালা। মাঝখানে গোটা কয়েক বড় পাথর সামান্য আলোতেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এগুলো আগেও ছিল, কিন্তু ঠিক এমনই ছিল না। রুক্ষ ধূসর চুলের রাশির ভিতর লুকিয়ে ছিল। ভাবলুম, পরিবর্তনটা শুধু কি তার বাইরেই এসেছে! মনে কি তার আঁচড় লাগে নি এতটুকু!

কাল লামা বলছিলেন, নিমা তাঁকে হিন্দুস্থানেব কথা জিজ্ঞাসা করছিল, কেমন দেশ হিন্দুস্থান, কেমন সেখানকার মানুষগুলো? সবাই কি আমার মতো? কী উত্তর তিনি দিয়েছিলেন, আমাকে তা জানান নি। জানাবার প্রয়োজন হয়তো মনে করেন নি।

অদ্ভুত এই মেয়েটা! কথা বলতে পাবে না বলে কি কথা বোঝাতেও পারে না! আমাদের দেশের সব মেয়েই কি সব সময় সব কথা বলতে পারে! জগতের প্রথম নারীও কি প্রথম থেকেই কথা বলতে পারত! ভাব বিনিময় তো কারও ঠেকে থাকে নি। ঠেকে থাকেও না। মুখোমুখী দুটো যন্ত্রের একটা যখন বাজে, তখন সেই সুরে বাঁধা অন্যটার তারেও কি ঝঙ্কার ওঠে না! আত্মার সঙ্গে মিলন হয় না আত্মার! জগতের এই কি নিয়ম নয়!

নিমা তবু চুপ করেই রইল।

অন্ধকারের আয়ুক্ষয় হচ্ছে।

একে একে চাকরেরা উঠল জেগে। কেউ গলা খেঁকরে খানিক-ক্ষণ কাশল, কেউ বিড়িতে আগুন দিয়ে গভীর ভাবে টানতে লাগল। একসময় নিমা উঠে তাঁবুর ভিতর তার স্বামীদের জাগাতে গেল।

কনকনে হিম হাওয়া আসছে দক্ষিণ থেকে। বুকের পাঁজরা-গুলোও থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। দাঁতে দাঁত যাচ্ছে লেগে।

এবার ছেরিং পেনছো এল তাঁবুর বাইরে। বেরিয়েই হাঁক ডাক শুরু করল। চাকরেরা বিড়ি ফেলে আর কাশি থামিয়ে তটস্থ হল। অন্ধকারেই তাঁবুর দড়াদড়ি ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। দু একজন ছুটল তাদের ছাগল ভেড়া আর ইয়াকগুলোকে ধরে আনবার জন্য। সারাদিন এগুলো বোঝা নিয়ে পথ চলে, আর সারারাত এরা চরে খায়। ঘুমোয় কখন্ আর কখন্ বিশ্রাম করে, তা শুধু ওরাই জানে। অনেক সময় হারিয়েও যায় এক আধটা জানোয়ার। চরতে চরতে এগিয়ে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলে। সেগুলো ফেলে রেখে এরা যায় না, ফেলে গেলে একটা একটা করে কমে একদিন এই ভারবাহী জন্তুগুলো শেষই হয়ে যেত। যাত্রার সময় পেছিয়ে দিয়ে এরা খোঁজে, খুঁজে পেয়ে তবে যাত্রা শুরু করে। এমনই করে একদিন তাদের জানোয়ার খুঁজতে গিয়ে তারা আমায় খুঁজে পেয়েছিল। আজ কিন্তু আমাকে ফেলে রেখে এরা দেশে ফিরে যাচ্ছে। আমি এদের ভার না হয়ে ভারবাহী হলে আমায় ফেলে এরা কিছুতেই যেত না।

খানিকক্ষণ পরেই জানোয়ারগুলোকে তাড়িয়ে চাকররা ফিরে এল। সব কটাই পাওয়া গেছে। মালপত্র তৈরি করে এরা বসেছিল। ওরা ফিরতেই বাঁধা-ছাঁদা শুরু হয়ে গেল। আজ তাদের আঙুলগুলো যেন কেটে যাচ্ছে, ভারি ভারি বোঝা তুলেও তাদের ঠাণ্ডা দেহ আজ গরম হচ্ছে না। কে একটা রসিক লোক সুর করে গেয়ে উঠল ঃ

গিয়ে লাম ভুল পে তা না
ছ্যো লুক্ মান্ডা মান্ডা
চো লা ঙা রে তা না।
ঠাগ্ লা লুঙ্-পো ছেন্-ঙে
ইয়া ইয়া গ্যু গ্যু জের।

সমস্বরে আর কয়েকজন গেয়ে উঠল :

ইয়া ইয়া গু্য গু্য জের।

তাদেরও প্রাণ আছে।

একগাছা লাঠি আমি সংগ্রহ করেছিলুম উমেদ সিংয়ের কাছে। সেই লাঠিগাছটা ধরে আমি এদের যাত্রার উদ্যোগ দেখতে লাগলুম।

আজ এরা রাক্ষসতালের ধার দিয়ে গিয়ে থারচেনের কাছে গোম্ফায় রাত কাটাবে। নিমার স্বামী হয়তো ভালই আছে। এখানে সকলেই ভাল হয়ে যায়। অসুখ হয়, আবার ওষুধ না খেয়েই সে অসুখ সেরে যায়। তা না হলে এ দেশে কেউ বাঁচত না।

জানি না এরা কৈলাস পরিক্রমা করবে কিনা। না করলেও কৈলাসের চিরতুষারাচ্ছন্ন শৈল শিখরের দিকে চেয়ে দু চোখ জুড়িয়ে নেবে। তারপর মানস সরোবরকে দক্ষিণে রেখে থারচেন টকচেন হয়ে দেশে ফিরবে।

হঠাৎ আমার মনে পড়ল, সেই সুইস পরিব্রাজক সিউয়েন হেডিনের কথা। যিনি মানসের জলে ক্যাম্বিসের নৌকা ভাসিয়ে মাসাধিক কাল তার সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন মুগ্ধ কবির মতো। পশ্চিমে দেখেছেন শতদ্রু-সিন্ধুর সুন্দর অবতরণ, দক্ষিণে ও পূর্বে কর্নালী আর ব্রহ্মপুত্রের। মানসকে এমন হৃদয় দিয়ে দেখা বোধ হয় আর কেউ কোন কালে দেখেন নি।

হেডিন হিন্দু ছিলেন না, বৌদ্ধও নন। ধর্মের ডাক তাঁর নাড়িতে ছিল না। তবু সেই পরিব্রাজক যে-কোনও হিন্দু আর বৌদ্ধের চেয়ে বেশি ভালবেসেছিলেন এই মানস আর কৈলাসকে। শুধু ভালবেসেই তৃপ্ত হন নি, সমস্ত জগৎকে এই মহান আকর্ষণের গল্প শুনিয়েছেন। জগতে এমন স্থান নাকি আর দ্বিতীয় নেই।

গ্যান-টক গোম্ফার নিচে দিয়ে গেছে তীর্থযাত্রার পথ। সেই পথে ভারতের যাত্রীরা কৈলাস থেকে নেমে আসে মানসের তটে। আমি দেখলুম, ঝব্বুর পিঠে বসে অশক্ত স্ত্রী-পুরুষ আগে আগে নেমে আসছে। তার পিছনে সমর্থ পুরুষ আসছে লাঠি ঠুকে ঠুকে। আর

সকলের পিছনে আসছে ঝব্বু আর গাধার দল, পিঠে বোঝা নিয়ে নিরাসক্ত নির্বিকার পদে।

মনে পড়ল উমেদ সিংএর কথা। গ্যানিমার মণ্ডি হয়ে সে পুরাং যাবে, সেখান থেকে আসকোট্। কৈলাস থেকে যে যাত্রীরা ফিরছে, তারাও আসবে পুরাং। সেখান থেকে আসকোটের পথে আলমোড়া কিংবা টনকপুর। শুধু পথের একটু হের-ফের। ভাবলুম, এইটুকু পথ ঘুরে গেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

আজ লামা আমার পাশে নেই। থাকলে এই প্রশ্নটা তাঁকে করতুম। মনে হল, এই প্রশ্নের উত্তর দেবার ভয়েই বুঝি কাল রাতে তিনি পালিয়ে গেলেন। কিন্তু পালিয়ে কোথায় যাবেন। যে পথে এরা যাবে, তারই পাশে পড়েছে ওয়াং ডাকের তাঁবু। সামনে দিয়ে যাবার সময় ঘুম ভাঙিয়ে এই প্রশ্নটা জানালে উত্তর তাঁকে দিতেই হবে।

আর অপেক্ষা না করে আমি একাই এগিয়ে গেলুম। উমেদ সিংএর তাঁবু অন্য ধারে। ছেরিং পেনছোর ছোট ভাইটা একটা বোঁচকার উপর বসে ঘুমে ঢুলছিল। হঠাৎ জেগে উঠে অবাক হয়ে আমাকে দেখতে লাগল। কী একটা বলে বোধ হয় নিমার দৃষ্টিও আকর্ষণ করল। পিছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারলুম, সবাই আমার আকস্মিক আচরণে আশ্চর্য হয়েছে। হাতের কাজ ফেলে তাকিয়ে আছে আমার পায়ের দিকে।

লামাকে আমি ডেকে তুললুম। উত্তেজিতভাবে আমার বলার কথা সরল ভাবেই জানিয়ে দিলুম। যাবার আগে দেখা করে যাব, কথা দিয়েছিলুম। সেই কথা রাখতে এসেছি। গ্যানিমা হয়ে আসকোট যাচ্ছি না, যাচ্ছি মানস সরোবর আর কৈলাস ঘুরে। আসকোটে উমেদ সিংএর সঙ্গে দেখা করব।

লামা তাঁর দু হাতের মুঠো দিয়ে দু চোখ একবার রগড়ে নিলেন। ছোট ছোট চোখ দুটিতে ঘুমের নেশা তখনও খানিকটা লেগে ছিল।

চিন্তিতভাবে বললেন : ভাল কথা। কিন্তু থারচেন থেকে পূবে আর এগিও না।

বললেন : ছো-মা ফামের তীরে দাঁড়িয়ে প্রণাম ক'র খাং রিমপোছের দেবতাকে, সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে। প্রাণ ভরে তাঁর আশীর্বাদ চেয়ো। ব'ল, প্রেম যেন তোমাকে পথভ্রষ্ট না করে। মৃত্যুর চেয়ে ভয়ের হবে সেই পরাজয়।

আমি চমকে উঠলুম। লামা আজ এ কী সন্দেহের কথা বলছেন!

নিমারা তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। একে একে সবাই তাঁকে প্রণাম করে গেল। লামা নিমাকে কাছে ডেকে নিয়ে কী সব নির্দেশ দিলেন। অন্ধকারেও আমি স্পষ্ট দেখলুম, নিমার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠে আবার হঠাৎ নিবে গেল। মাথা নেড়ে কী প্রতিশ্রুতি লামাকে দিয়ে গেল, তা সেই জানে। আমি শুধু বেদনার ছায়া দেখলুম তার চোখের ভাষায়।

লামা বললেন : যাও, নিমা তোমাকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল। তার কথার অবাধ্য কোনদিন হয়ো না।

রক্ষার কথা কেন ভাবছেন : আমি জিজ্ঞাসা করলুম : প্রাণ হারানোর কি কোনও আশঙ্কা আছে?

উত্তরে লামা শুধু হাসলেন।

আমি আর কোন প্রশ্ন তাকে করলুম না। নিচু হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলুম।

লামা তাঁর হাতখানা আমার মাথার উপর রেখে আস্তে আস্তে বললেন : বুদ্ধ তোমাদের আশীর্বাদ করুন।

নিজে কোন আশীর্বাদ করলেন না।

একুশ

আজ আমি আমার খোঁড়া পা নিয়েই এগিয়ে চলেছি। আজ মনেই হচ্ছে না যে আমার খোঁড়া পা। যে মেয়েটা সব সময় সকলের আগে এগিয়ে চলতে পারে, সেই আজ পিছিয়ে পড়েছে। বারে বারে পথের ধারে বসে দম নিচ্ছে, পাহাড়ে ঝরনা দেখেই আঁজলা ভরে জল ধরে খাচ্ছে। আগে কোনদিন তাকে জল খেতে দেখি নি।

আমি আজ তার পিছিয়ে পড়া দেখে ছেরিং পেনছোর সঙ্গে এগিয়ে চলেছি। সে যখন বসেছে আমরাও বসেছি খানিকটা তফাতে। প্রথমটায় ছেরিং পেনছো আমার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেছিল। আমিও না বুঝে তার জবাব দিয়েছিলুম। সে বুঝতে পেরেছে কিনা জানি না, তবে আর উত্তর দেয়নি সে কথার। এখন দরকার হলে আমরা ইশারায় কথা বলি।

চলতে চলতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলুম ভাবছিলুম, নিমার আজ এ কী হল? অসুস্থ স্বামী অচৈতন্য পড়ে আছে একটা মঠের ভিতর। সেই ভাবনায় মেয়েটা সারারাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। কিন্তু যখন চলবার সময় এল, তখন পায়ে আর শক্তি পাচ্ছে না। এটুকু পথ বুঝি একদিনে শেষ করা যাবে না!

দেখতে পাচ্ছিলুম, ছেরিং পেনছো মাঝে মাঝেই তাকে তাড়া দিচ্ছে। নিজে পিছিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। তবুও পিছিয়ে পড়ছে নিমা। পায়ে কি তার ফোসকা পড়েছে, না কাল বিয়ের ভোজ খেয়ে পেটে ব্যথা ধরেছে আজ!

শেষ পর্যন্ত পথেই তাঁবু ফেলতে হল। শেষ রাতে যাত্রা শুরু করেছি। ক্ষিধেয় ও ক্লান্তিতে দেহ আর কারও চলছে না। তাঁবু ফেলা দেখে নিমার উৎসাহ হঠাৎ বাড়ল। শেষ পথটুকু অতিক্রম করে

এল সুস্থ মানুষের মতো। আমার পাশ দিয়ে গিয়ে নিজের তাঁবুর ভিতর যখন ঢুকল, আমি তার চোখে মুখে প্রচুর আশ্বাসের ইঙ্গিত দেখলুম।

একটা পাথরের উপর বসে আমি আমার কল্পনাকে ছেড়ে দিলুম হাওয়ার পাখায়। আজ আমার কথা বলার সঙ্গী নেই। আজ শুধু ভাববার অবকাশ। আমার চারিদিকে মানুষ ঘুরে বেড়াবে, কথা বলবে, খাবে, ঘুমবে। আমি যেন মানুষ নই, অন্য কোন জগতের প্রাণীর মতো আমি তাদের দেখব, তাদের কথা ভাবব, আর আশ্চর্য হব।

তাঁবুর ভিতর হাপরের ফোঁসফোঁসানি শুনতে পেলুম। আর খানিকক্ষণ পরে হয়তো নিমার হাতের সুজা পাব। অকস্মাৎ কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে আরও দু একদিন এই সুজা আসবে।

নিমাব আজ অন্য রূপ আমি দেখলুম। যে মেয়ে স্বামীর ভাবনায় ঘুমতে পাবল না সারারাত, সে মেয়ে আজ ইচ্ছে করে পিছিয়ে রইল। একে ইচ্ছে করেই বলব। আমি না বললেও সবাই বলবে। চাকরেরা এ সব বুঝেই আজ অনুমতি না নিয়ে তাঁবু ফেলেছে।

কিন্তু নিমা এমন কেন কবল! ইচ্ছে হল, সোজাসুজি তাকে জিজ্ঞাসা করে এই প্রশ্নের উত্তর নিই। এদেব ভাষা জানলে আজ সকলেব আগে আমি তাই করতুম।

আমার সঙ্গে একটা দিন বেশি কাটাতে চায়? তা কেন হবে! আজ শেষ রাতে যখন সে যাত্রা করছিল, তখন তো সে আমাকে ফেলে আসছে বলেই জানত। আর আমাকে ফেলে আসতেই বা তার দুঃখ হবে কেন! একটা অজ্ঞাত বিদেশী মানুষ। তার সেবা করেছে কর্তব্য বলে! কিন্তু সেই সেবায় আন্তরিকতা ছিল। তাব বেশি নিশ্চয়ই কিছু নয়।

আর একটা কথা মনে এল। নিমা কি তার বাহিরের পরিবর্তনের কথা ভাবছে! তার স্বামী এই পরিবর্তনকে কী চোখে দেখবে, এই কি তার ভয়? সংস্কারের আবর্জনায় অন্ধকার যে দেশ, সে দেশের লোক কি এই আলোর আস্বাদটুকু সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারবে না?

মনে হল, আমার প্রশ্নের উত্তর বুঝি আমি নিজেই খুঁজে পাচ্ছি। নিমার স্বামী নিশ্চয়ই এই পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করবে। দীর্ঘ উনত্রিশ বছরের সংস্কারকে উপেক্ষা করার মতো শক্তি এ মেয়েটা কোথায় পেল! গভীর ধর্মবিশ্বাসে জড়িয়ে আছে এদের সমাজ-জীবন। ধর্মের চেয়ে বড় বলে কী পেয়েছে নিমা?

গত কয়েকদিনের ঘটনা আমি ভাবতে বসলুম। তার বিশ্বাসের ভিত্তিকে টলাতে পারে এমন তো কিছুই ঘটে নি। সেই ছোকরা লামার হঠকারিতা! সে তো এ দেশে হামেশাই ঘটছে।

তবে কি—

একটা অদ্ভুত ভাবনায় আমার হাত পা হঠাৎ অসাড় হয়ে এল। তবে কি আমিই নিমার এই পরিবর্তন আনলুম? তার এই পরিবর্তনের জন্য নিমা কি আমাকে দায়ী করছে? তার স্বামীও কি তারই মতো আমাকে সন্দেহ করবে? কিন্তু আমি তো কাউকেই কিছু বলি নি। এ নিমারই দোষ। তারই তো সাবধান হওয়া উচিত ছিল। যা ভাবতে তার ভয় করে, কোন্ সাহসে সে তা করতে গেল?

নিমা কখন এসে স্তজার বাটি সামনে ধরেছিল টের পাই নি। তেমনই পরিষ্কার ঝকঝকে বাটি। মুখে এক রকমের অদ্ভুত শব্দ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। চায়ের বাটিটা হাতে নিতেই সে আবার তাঁবুর ভিতর ফিরে গেল।

কাল কী হবে সেই ভাবনা এল মনে। আমার উপস্থিতি যে একটা নোংরা পরিস্থিতিকে ঘোলা করে তুলবে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের সমাজের রীতিনীতি আমার জানা আছে। অভিযোগ আমরা আদালতে জানাই, দীর্ঘদিন ধরে তার বিচার হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সুবিচারও হয়। এদের আদালত এদের কোমরে গোঁজা কিংবা পিঠে বাঁধা। অভিযোগের কারণ ঘটেছে মনে করলেই কোমরের ছুরি কিংবা পিঠের বন্দুক নামিয়ে একতরফা বিচার শেষ করে দেয়। ভাবনার কথাই বটে।

মনে হল, এ পথে এসে ভুল করেছি। শুধু যে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছি তা নয়, আর একটা নির্দোষ মেয়েকেও জড়িয়েছি সঙ্গে সঙ্গে। আমাকেই উপলক্ষ করে হয়তো একটা পারিবারিক দুর্যোগ তাদের ঘনিয়ে উঠছে। আমি সঙ্গে না থাকলে দুর্যোগটা হয়তো নিমা এড়াতে পারত।

ভাবলুম, রাতারাতি ফিরে যাই—যে পথে এসেছি সেই পথেই। গ্যাকার্কোর মণ্ডিতে উমেদ সিং না থাক, অন্য ভারতীয় আছে। সে হয়তো উমেদ সিংএর মতোই আগ্রহ করে আমাকে সঙ্গে নেবে। এমনই একটা সংকল্প নিয়ে রাতে ঘুমতে গেলুম।

কিন্তু ফেরা হল না। ভোরবেলায় নিমার হাতের ছোঁয়ায় ঘুম ভাঙল। যাত্রার আয়োজন করে সবাইকে সে তখন ঠেলে তুলছে।

লাঠিগাছটা সংগ্রহ করে আবার এসে পথে দাঁড়ালুম। আবার সন্দেহ জাগল মনে। কাল যে মেয়েটা কিছুতেই পথে চলতে চাইছিল না, আজ সে-ই সবাইকে ঠেলে তুলেছে। অকারণে ঘুমিয়ে থেকে যাত্রার সময় তো পিছিয়ে দেবার চেষ্টা করে নি!

পা দুটো যখন চলে, মন তখন ঘুমোয় না। বন্ধুর পথ দুর্গম হলে দৃষ্টির সঙ্গে সংহত হয়ে মনও মশগুল হয়ে থাকে আত্মরক্ষার চিন্তায়। কিন্তু পথ যখন সমতল, হোঁচট খাবার ভয় নেই বলে মন যখন নিশ্চিন্ত, তখন সেই মনেরই অন্য রকম ভাবনা। কল্পনার পাখায় ভর করে স্বপ্নের দেশে উড়ে যায়। পথ চলতে চলতে আমি নিমার কথাই ভাবতে লাগলুম। মনে হল, তার আজকের আচরণের একটা যুক্তি খুঁজে পেয়েছি। দিনের আলোয় সে তার স্বামীর সামনে পৌঁছতে চায়—দিনের আলোয় বুঝি মৃত্যুর বিভীষিকা নেই।

আজ যে প্রান্তরের উপর দিয়ে চলেছি, সেও রুক্ষ, বৃক্ষলতাহীন অধৈর্য প্রান্তর। জলধারার পাশে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে যে তৃণগুল্ম দেখছি, তারও কোন শ্যামলিমা নেই। এক জায়গায় গোটাকয়েক

সব খরগোশ দেখলুম। ব্রাম্বিশাকের মতো পাতার কাঁটাঝোপ, তারই আড়ালে কাঁটা বাঁচিয়ে পাতা খাচ্ছে। পথের উপর মানুষের পায়ের শব্দ পেয়ে অতর্কিতে তারা অন্তর্হিত হল।

পরিচ্ছন্ন রৌদ্রকিরণে উত্তাপ লাগছে বাতাসে। নিঃশ্বাসেও টান ধরছে অল্প অল্প। মনে পড়ল, নিঃশ্বাসে এমনই টান ধরছিল আস্তাধুরার গিরিবর্ত্ম অতিক্রমের সময়। সে আজ অনেকদিন আগের কথা। কৈলাস পরিক্রমার সময়েও নাকি নিঃশ্বাসের এমনই কষ্ট হয়।

বেলা দুপুরের আগেই আমরা গ্যাংটক গোম্ফায় পৌঁছে গেলুম। কৈলাসের পাদমূলেই এই মঠ। এখান থেকেই কৈলাস পরিক্রমার শুরু এবং এইখানেই শেষ। মঠের চারদিকে অনেক তাঁবু পড়েছে। বণিক ও তীর্থযাত্রী দু দলেরই সেখানে সমান ভিড়।

মঠের ভিতর যাত্রীদের থাকবার ঘরেই আশ্রয় পেয়েছিল নিমার বড় স্বামী। আড়ালে থেকে তাকে দেখলুম। অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠে বসেছে। সামনে যাবার সাহস হল না। সে আমার জন্য নয়, নিমার কল্যাণেই। মনে হল, তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের ভিতর আমি তো বাহুল্য। শুধু তাই নয়, আমি তাদের শান্তি ভঙ্গ করেছি। তাই আমি মঠের ভিতর ঘুরে ঘুরে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগলুম।

এর আগে আমি কখনও মঠ দেখি নি। এটি ছোট কি বড়, তা জানি নে। তবে শতাধিক লামা এখানে বাস করেন বলে মনে হল। তাঁদের জন্য গুহার মতো সারি সারি ঘর আছে। নির্জন অন্ধকার ঘরগুলো নিশ্চিন্ত বিশ্রাম আর কঠোর সাধনার জন্য মনোরম। এঁদের প্রার্থনার ঘর দেখলুম। সেখানে অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের মূর্তি। দেখলুম এঁদের পুঁথির ঘর। সেখানে অসংখ্য পুঁথি তাকে তাকে সাজানো আছে। রঙ-ওঠা লাল কাপড় দিয়ে সে সব ঢাকা। দেওয়ালে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ছবি দেখলুম অগণিত, পাথর ও ধাতুর নানা মূর্তিও সাজানো দেখলুম।

নিমা তার স্বামীর কাছে গিয়েছিল। কেন জানি না আমার বাংলা দেশের নববধূর কথা মনে পড়ল। বিয়ের পরে নতুন বউ এসেছে শ্বশুর-ঘর করতে। সেখানে তার খাণ্ডারণী শাশুড়ী আর ননদ আছে। তারা তার প্রত্যেকটি ত্রুটির জন্য কৈফিয়ত চাইবে নিষ্ঠুর ভাবে। নিমার বিচারের রায় শোনবার জন্য আমি আড়ালে কান পেতে রইলুম।

কিন্তু কান পেতেই বা করব কী! এ দেশে কানের প্রয়োজন তো আমার ফুরিয়ে গেছে। যা দরকার, সে শুধু চোখ দুটোর, যে দুটো মেলে থাকলে কানের অভাব খানিকটা মেটানো যায়।

নিমার কী শাস্তি হল শুনতে পেলুম না। সামনে দাঁড়িয়ে দেখবার সাহস যখন ছিল না, তখন আর আপসোস করে লাভ কী! মনে মনে স্থির করলুম, সামনে গিয়ে বিপত্তি আর বাড়াব না।

দিনের আলো শেষ হবার আগেই দুদিক থেকে যাত্রীরা আসবে। কেউ আসবে দক্ষিণ থেকে পরিক্রমা শুরু করতে, আর কেউ আসবে উত্তর থেকে পরিক্রমা শেষ করে। সে সময় একটু তৎপর হয়ে কি কোন ভারতীয় দলকে খুঁজে বার করতে পারব না! হঠাৎ এক রকমের আনন্দে বুকখানা দুলে উঠল। একটা নির্দোষ মেয়ে আমার জন্য অকারণে নিগৃহীত হবে না, এ কি কম আনন্দের কথা!

নিমার হাত থেকেই দুপুরের আহার্য পেলুম। আহারে আমার মন ছিল না। আমি তার মুখের দিকে চেয়ে মনের খবর আহরণের চেষ্টা করলুম। থমথমে আকাশের মতো তার গম্ভীর মুখ, যেন প্রথম বর্ষার ঘন মেঘ থেকে অবিশ্রান্ত বর্ষণ হয়েছে অনেকক্ষণ। ভাবনায় কিংবা বেদনায় আজ ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

ছেরিং পেনছো এক এক খণ্ড শুকনো মাংস স্বচ্ছন্দে চিবোতে চিবোতে, হাতে এক বাটি মদ। ভারি খুশী দেখাল তাকে।

গদগদভাবে নিমাকে যা বলে গেল, শুনে মনে হল তাকে ভরসা দিচ্ছে। মানে, তার মতো একজন অনুগত স্বামী থাকতে নিমার ভয় করবার কী আছে। দরকার হলে বড় ভাইকেও শিক্ষা দিয়ে দেবে জন্মের মতো।

নিমার মুখে কিন্তু পরিবর্তন দেখলুম না। একুশ বছরের একটা অকেজো অপদার্থ ছেলের কথায় নিশ্চিন্ত হতে পারে, ব্যাপারটা এমন সহজ নয়। নিমা তার বুদ্ধি দিয়ে আর স্বজ্ঞা দিয়ে অন্ধকার ভবিষ্যৎটা যেন দেখতে পাচ্ছে।

মঠের বাইরে নিমারা তাঁবু খাটিয়েছে। সেইখানে নিয়ে গেছে তার অসুস্থ স্বামীকে। আমি তখন পাশের সেই সংকীর্ণ দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলুম। নিমাব বড় স্বামী আমাকে দেখতে পেয়েছে। প্রথমেই চিনতে পেবেছিল কিনা জানি না, কিন্তু সন্দেহের চোখে দেখে গেছে। খানিকক্ষণ বসে থেকে আমি উঠে এসেছিলুম যাত্রীদের বড় ঘরখানায়। শ ছুই যাত্রী এখানে গাদাগাদি হয়ে রাত কাটাতে পাবে। যত বেশি লোক হয় তত আরাম এখানে। বাইরে যখন বরফের কণার মতো হিম পড়ে, তখন এতগুলো লোকের নিঃশ্বাসে ঘবখানা গরম থাকে। কম্বলের পাশে একটা মানুষ না থাকলে কম্বল যেন ঠাণ্ডা থাকে সারারাত। নিমারা চলে গেলে আমি সেই মানুষদের অপেক্ষা কবতে লাগলুম।

বাইরে তখন ঝড়ের মতো হাওয়া বাইছে। দিনের দ্বিতীয় প্রহরে রোজই এমন হাওয়া বয়। কিন্তু আজ যেন সেই হাওয়া বুকের পাঁজরায় এসে আঘাত করছে, অস্থির করছে আর বিপর্যস্ত করছে মনটাকে।

এক সময় মঠের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম। কৈলাসের শুরু এইখান থেকেই। পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ঝরণা দুরন্ত মেয়ের মতো ঝরঝর করে নেমে এসেছে। তারপর দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে স্থূলাঙ্গী নারীর মতো। দুই পারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা

করছে একটা কাঠের সেতু। কৈলাস-ফেরত যাত্রীরা এই পথে মঠে ফিরবে।

মনে হল, যারা ফিরবে তাদের সঙ্গে আমার ভাব হবে না। তাদের সঙ্গে আমার অন্তরের যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। মুঠো করে যে রত্ন তারা নিয়ে আসছে, আমি তার ভাগ পাব না। বুকের ক্ষুধা তারা চিরকালের মতো মিটিয়ে আসছে। আমি কোন্ সান্ত্বনা নিয়ে তাদের সঙ্গে ফিরে যাব।

তাড়াতাড়ি আমি মঠের সামনে ফিরে এলুম। মুখ বাড়িয়ে নিচের পুরনো পথ দেখতে পেলুম। নিঃসাড়ে পড়ে আছে। এই প্রাচীন পথে আসবে ক্ষুধার্ত নরনারীর দল। তাদের বুকের ভিতর আমারই মতো দুরন্ত ক্ষুধা জ্বলছে দীর্ঘদিন থেকে। নিজের দেশে গণ্ডেপিণ্ডে গিলেও তাদের সে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় নি। এই দুর্গম দুস্তর পথে অনাহারে অনিদ্রায় লেংচে লেংচে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে। প্রাণের মায়া জন্মের মতো ত্যাগ করে আসছে। এই হ্যাংলারাই তো আমার আপনার জন। এদেরই জন্য আমার নাড়ির টান। কিন্তু কই, কেউ তো আসছে না আজ এদিক থেকে!

সন্ধ্যার ছায়া নামছে ক্লান্ত পথের উপর। পশ্চিমের বাতাসে বরফের কণা দানা বাঁধছে, ছুঁচের মতো বিঁধবে সারারাত।

আর মাত্র একটি রাত। চরম বোঝাপড়ার জন্য এত দীর্ঘ সময়ের বুঝি দরকার ছিল না।

বাইশ

মঠের ভিতর যেন ঘণ্টাধ্বনি শুনলুম। মনে হল, মঠবাসীরা এই সঙ্কেতে কোন কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। কৈলাস-ফেরত কয়েকটি তিব্বতী পরিবার এই ঘরটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁরাও সজাগ হয়ে উঠে পড়লেন।

হস্টেলে থেকে যখন কলেজে পড়তুম, প্রহরে প্রহরে তখন ঘণ্টা বাজত। প্রত্যেকটি ঘণ্টার সঙ্গে তখন পরিচয় ছিল। ঘণ্টাকে শুধু একটা ধ্বনি বলে মনে হত না। প্রত্যেকের কাছে তার নির্দিষ্ট অর্থ ছিল, এবং সে অর্থ বাদক ও শ্রোতা উভয়ের কাছেই সমান নির্দেশপূর্ণ। আজ মঠের ঘণ্টা শুনে আমার সেই ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ল।

তিব্বতী পরিবারের অনুসরণ করে আমিও মঠের আরাধনার কক্ষে এলুম। ঘরটি এখন আলোয় আলোকময় হয়েছে। দীপাধারে মাখনের প্রদীপ জ্বলছে। তারই পাশে পিতলের আধারে তাল তাল মাখন সঞ্চয় করা আছে। চারিদিক থেকে উগ্র গন্ধ উঠছে লাল ধূপের।

আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, সভ্য দেশের সৈন্যদের মতো সারি দিয়ে লামারা কক্ষে প্রবেশ করছেন এবং নিঃশব্দে নিজ নিজ আসনে গিয়ে বসছেন। প্রধান লামা এসে তাঁর কাঠের আসনে উঠে দাঁড়ালেন। উদাত্ত স্বরে মন্ত্রপাঠ করলেন খানিকক্ষণ। অন্যান্য লামারাও এক সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করলেন। তারপর স্তব্ধ হয়ে ধ্যান করলেন কিছুক্ষণ। যাবার আগে আর একবার মন্ত্রপাঠ করে বিদায় নিলেন।

আমার মনে পড়ল, আমাদের দেশের বিশ্বনাথ বা বৈদ্যনাথের শৃঙ্গার আরতির কথা, গম্ভীর উদাত্ত স্বরে বেদ গানের কথা। এদের

সন্ধ্যারতির সঙ্গে কোথায় যেন তার মিল খুঁজে পেলুম। মসজিদের প্রাঙ্গনে সমবেত হয়ে মুসলমানদের নমাজ পড়তে দেখেছি, গীর্জায় সম্মিলিত হয়ে খ্রীষ্টানদের বন্দনা গান করতে শুনেছি, উপাসনা সঙ্গীতও শুনেছি ব্রাহ্মদের। এ সবের ভিতর কোথায় যেন একটা মূলগত মিল আছে। ভগবান এক বলেই কি তাঁকে স্মরণ করার রীতিতেও এই একতা!

আমরাও আবার আমাদের ঘরে ফিরে এলুম।

কৈলাসযাত্রী আজ এ ঘরে একজনও নেই। পরে এর কারণ জেনেছিলুম। ভারত থেকে তীর্থযাত্রী যাঁরা আসেন, তাঁরা দূর প্রান্তর পেরিয়ে থারচেনে ছাউনি ফেলেন। অনেকে বিশ্রামও নেন গোটা একটা দিন। মঠে আসতে তাঁদের বড় ভয়। তাঁরা সাহেবদের বইয়ে পড়েছেন যে মঠে এলেই লামারা চা খেতে দেন—তাঁদের নুন-মাখন মেলানো চা। মুখে দিতেই তা বমি হয়ে যায়। আর বমি হলে কিছুতেই রক্ষে নেই। চকচকে ঝকঝকে ছুরি সোজা ঢুকিয়ে দেবে পেটের ভিতর।

কারও ভয় অন্য রকমের। আমাদের দেশের মন্দির মানেই তো পাণ্ডার রাজ্য। সেখানে ঢুকলে কিছু দণ্ড যাবেই। মঠও তো মন্দির, এখানে কি আর সে ভয়টা নেই! তিব্বতের মঠে অগণিত লামার বাস। বাইরে বেরিয়ে তাঁরা যাত্রীদের ডাকেন হাতছানি দিয়ে। উদ্দেশ্য কি তা জানা নেই। তাই কী দরকার এ সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাবার! তার চেয়ে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ!

মুজতবা আলি সাহেব পাণ্ডাদের অত্যাচারের কথা এক জায়গায় লিখেছেন। তাঁর মতে সর্ব দেশে সর্ব ধর্মের পাণ্ডাই একরকম। কিন্তু বৌদ্ধদের এই সব মঠ দেখলে তাঁর মত যে বদলাবে তাতে সন্দেহ নেই। এখানে লামারা চাইতে জানেন না। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেউ কিছু দিলে মঠের নামে তা জমা হয়। কে একজন অবশ্য বলেছিলেন যে, সভ্য মানুষের সংস্পর্শে এসে এঁরাও আজকাল চাইতে শিখেছেন।

আমি এ কথা মানতে পারি না। আমার কাছে কেউ তো কিছু চান নি।

একটু রাতে দুখানা কম্বল নিয়ে নিমা আমাকে খাওয়াতে এল। আমি আর তার তাঁবুর ধারে যাই নি। দেখি নি কোথায় তার তাঁবু পড়েছে। কেউ না বলে দিলেও অনুমান করতে পারি যে কাল ভোরেই তারা দেশে ফিরবে। এতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

ছাতু মিলিয়ে স্থজা খাচ্ছিলুম। এমন সময় ছেরিং পেনছো এল ব্যস্তভাবে। গড়গড় করে কী খবর দিয়ে গেল এক নিঃশ্বাসে। নিমার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল দেখলুম। অসহায়ভাবে তাকাল তার সেজো স্বামীর দিকে।

আজ নিমার চোখে আমি জল দেখলুম। ফরসা গালের উপর দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি তখন হতবাক হয়ে গেছি।

চারদিকে যারা ছড়িয়েছিল, তারাও উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে দেখলুম। সবটুকু শুনতে না পেয়ে প্রচুর কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। ছেরিং পেনছোকে কে একজন একটা প্রশ্ন করেই বসল। কিন্তু নিমার চোখের দিকে চেয়ে উত্তরটা সে বোধ হয় এড়িয়ে গেল।

আমার ইচ্ছে করছিল, গ্যাকার্কোর মণ্ডি থেকে আমাদের বুড়ো লামাকে ধরে এনে নিমার দুঃখের কথাটুকু জেনে নিই। জেনে নিই আজ কোন্ দুর্ভাবনার সংবাদ তাকে এমন উতলা করেছে। তার বড় স্বামী কি কোন হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে! তীর্থযাত্রা শেষ না করেই কি তারা খুন জখম শুরু করবে! ভাবতে ভয় হল যে মঠের ভিতর মানুষ খুন করবে, এমন পাষণ্ডও আছে তিব্বতে!

তারপরে ভাবলুম, নিমার যদি কোন বিপদ হয়। সে তো মঠে নেই! স্ত্রীকে অবিশ্বাসী সন্দেহে যদি তাকেই কেটে ভাসিয়ে দিয়ে যায় পিছনের ঝরনার জলে! যারা জানবে, তারাও কোন প্রশ্ন করবে না কোনদিন। এ দেশে এসব এমন তুচ্ছ ব্যাপার যে কেউ কোন গুরুত্ব দেয় না এতে। যেন একটা মশা এসে কানের কাছে বিরক্ত

করছিল, এক চড়ে সেটাকে শেষ করে দেওয়া হল। বিরক্ত করবারও দরকার নেই। হাতের কাছ দিয়ে একটা পিঁপড়ে যাচ্ছে, টিপে মেরে ফেলা হল। বেশ লাগল পিঁপড়েটাকে টিপে মারতে। একটা মানুষ মারার জন্য এই আনন্দটুকুই যথেষ্ট।

শোবার জন্য দুখানা কম্বল দিয়ে নিমারা চলে গিয়েছিল। আমার কিন্তু ঘুম এল না। মনে হল আজ রাতে ঘুমিয়ে পড়লে কাল সকালের আলো আর দেখতে পাব না। নিমার চোখে আজ জল দেখেছি। সে অশ্রুর নিশ্চয়ই একটা গভীর অর্থ আছে। নানা বৈচিত্র্যে কণ্টকিত ছিল আগের কয়েকটা দিন, দুর্দশা আর দুশ্চিন্তা জড়ানো নিষ্ঠুর দিন। কিন্তু নিমার শান্তি তাতে নষ্ট হয় নি। আজ কেন তার চোখে জল দেখলুম!

ঘরের ভিতর পুরুষ ও মেয়েরা নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমচ্ছে। বাচ্চা-কাচ্চাও যে দু-একটা আছে তাদেরও আর সাড়া নেই। মায়ের বুকের ভিতর মিশে গিয়ে তারাও ঘুমিয়ে আছে। আমি শুধু জেগে রইলুম।

তখন রাত কত হবে জানি না। আবছা আলোয় ঘরের ভিতরটা স্বচ্ছভাবে দেখতে পাচ্ছি। বড় দরজার কাছে একটি ছায়ামূর্তি দেখতে পেলুম। সমস্ত স্নায়ুগুলো সংহত করে আমি সেই মূর্তিকে অনুসরণ করলুম দৃষ্টি দিয়ে।

অকস্মাৎ আনন্দে ও বিস্ময়ে মন আমার ভরে উঠল। নিমা এসেছে। কিন্তু সে কথা কইতে আসে নি। আসে নি তার সঙ্গ দিতে। দু হাত দিয়ে আমায় টেনে তুলল, চোখের ইশারায় বলল তাকে অনুসরণ করতে।

পায়ে পায়ে তার সঙ্গে প্রশস্ত পথে নেমে এলুম। চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত পথ। আজও আকাশে মদের ভাণ্ড উল্টে গেছে। কুয়াশার গা চুঁয়ে চুঁয়ে সেই মদ গড়িয়ে পড়ছে। পৃথিবীটা বুঁদ হয়ে গেছে দুরন্ত নেশায়।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। এমন আলোর ভিতরেও আমার চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আছে! জগৎটা সংকীর্ণ হয়ে একটা ছোট গণ্ডির মতো কেন দেখাচ্ছে! আর সেই জগতে আমরা দুটো প্রাণী!

কতকটা ছুটতে ছুটতে আমরা চলেছি। পথের কাঁকরে হোঁচট খাবার আগেই নিমা আমাকে ধরে ফেলেছে। নিশ্চিত পতন থেকে বারে বারে আমাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছে এই শক্ত তিব্বতী মেয়েটা। তার চোখের দৃষ্টি আমার চেয়ে কম নয়। জীবনের পথেও আমি এমনই হোঁচট খাচ্ছিলুম। সারাটা পথ আমাকে বাঁচিয়ে এনেছে। এবারও বোধ হয় বাঁচাবার জন্যই এমন করে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার নতুন সবুজ পোশাকটি দেখলুম তার গায়ে। আজ আর সবুজ মনে হচ্ছে না। চাঁদের আলোয় তাকে ধূসর দেখাচ্ছে।

চলতে চলতে মানুষ থেমে পড়ে, অন্ধকারে হোঁচট খায়, পা মচকায়, খানায় পড়ে পাও ভাঙে। জগৎটা কিন্তু থামে না, অন্ধকারে তার পথ হারায় না, মানুষের কান্নায় তার গতি কোন দিন হ্রাস হয় না। মনে হল, জগৎটা যদি আজ এই মুহূর্তে হঠাৎ থেমে পড়ত! এই পাহাড়টার উপর! তা হলে কুয়াশাও কি আর স্বচ্ছ হত না! উত্তরে কৈলাস আর দক্ষিণে মানস-সরোবরও কি আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যেত চিরদিনের মতো! কিন্তু কৈলাস আর মানসই তো সব নয়! যা থাকত আমার চিরদিনের হয়ে, তার দামও অনেক।

পৃথিবী তবু থামল না। আমরাও ছুটে চলেছি। একে ছোটাই বলব। পাহাড়ে-পথে আমরা এমন করে চলি না। নিমা আমাকে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে।

কিন্তু কোথায় সে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে! উত্তরে কৈলাসের চুড়োয়, না দক্ষিণে মানসের তটে! সেও কি পালিয়ে চলেছে ওই অমানুষগুলোর কাছ থেকে! নিমাও পালাচ্ছে! এই কনকনে ঠাণ্ডার ভিতরও সারা শরীর আমার ঘামে ভিজে গেল। কিন্তু

হৃৎপিণ্ডটা তো থামল না! ওটা যে আরও জোরে জোরে ধুকধুক করছে!

না না, এ আমার অন্যায় ভাবনা। অকারণে আমি তাকে ছোট ভাবছি। আমি যে তার দুর্বলতার কথা জানি। সে দুর্বলতা একটা বিদেশী যাত্রীর জন্য নয়, সে তার সংস্কারের প্রতি দুর্বলতা। তার একাধিক স্বামী আছে, তার সংসার আছে। তাদের জন্যই তার দুর্বলতা। আমি তার অতিথি হয়ে ছিলুম। অতিথিকে রক্ষা করার জন্য যে দুর্বলতা, তার উৎস ধর্মবিশ্বাসে। হৃদয়ের নিভৃত কোণে এই সুস্থ নারী অন্য কোন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবে না।

রাত কত হল? আকাশের চাঁদ দেখে প্রহরের হিসেব করতে শিখি নি। দিনের তৃতীয় প্রহরের পর থেকে পরদিন এক প্রহর পর্যন্ত শীতে বুকের হাড় পর্যন্ত কাঁপে। রাতে চাঁদ দেখে প্রহরের হিসেব করবে, এমন মূর্খ এদেশে নেই। তবে এরা রাতের তৃতীয় প্রহরে কী দেখে যাত্রা করে!

আর একটা চড়াইএর মাথায় এসে নিমা থামল। চারিদিকে তাকিয়ে মনে হল, একটা বিরাট প্রান্তরের মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কোনদিকে তার শেষ নেই। কত জিনিসেরই তো শেষ নেই! আমাদের কেন যাত্রা শেষ হল!

শ্রান্তিতে নিমা তখন হাঁপাচ্ছিল। আমিও হাঁপাচ্ছিলুম হাপরের মতো। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বুক ভরে দুজনে দম নিলুম।

কুয়াশা তখনও স্বচ্ছ হয় নি। কিন্তু সেই অস্পষ্টতা নিমার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে নি। যেদিকে যাচ্ছিলুম, সেই দিক দেখিয়ে নিমা বলল: ছো মাফাম্।

আঙুল দিয়ে তার পশ্চিমের তট দেখিয়ে বলল: গিয়োক্‌পো পের।

আর যা বলল, আমি বুদ্ধি দিয়ে তার অর্থ করলুম—সামনে মানস-সরোবর। তারই তীর দিয়ে আমার ফিরে যাবার পথ। আমি যেন আর দেরি না করি।

কিন্তু এই কি তার অন্তরের কথা!

চাঁদের আলোয় তার সুন্দর মুখখানি আবার দেখতে পেলুম। এক রকমের অদ্ভুত জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চোখের দৃষ্টি। সে যেন অন্য জগতের মানুষ, অন্য গ্রহ থেকে আজ বেড়াতে এসেছে।

কতক্ষণ নীরবে কাটল মনে নেই। সেদিন সময়ের হিসেব আমরা রাখি নি। আমার চমক ভাঙল নিমার হাতের স্পর্শে। সে তার সবুজ ছুরবাটা আমায় পরিয়ে দিচ্ছিল। তাকে আবার দেখলুম তার সেই পুরনো নোংরা ছেঁড়া পোশাকটায়। আজ তাকে বাধা দিতে আমি ভুলে গেলুম।

ডান হাতের মুঠোর ভিতর একটা কবোষ্ণ জিনিসের স্পর্শ পেলুম। আলোয় দেখলুম, একখানি মোহর। গলার মালা থেকে যে খুলে দিয়েছে, তার সাক্ষী দিচ্ছে একটি ছোট্ট গোল ফুটো।

আবার নিমাকে দেখলুম চাঁদের আলোয়। জলভরা মেঘের মতো থমথম করছে তার মুখখানা। গভীর ভাবে তাকাতেই মুক্তোর মতো বড় বড় ফোঁটায় অশ্রুর ধারা নামল। এত জল তার এতদিন কোথায় চাপা ছিল!

নিমা আমাকে দাঁড়াতে দিল না। দু হাতে ঠেলে দিল সামনের দিকে। শুধু একবার তার নরম হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিতে পেরেছিলুম। নিষ্ঠুর কুয়াশা আমাদের আড়াল করে দিল।

পথে চলতে চলতে কবির কথা আমার মনে পড়ল :

তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে,
তাকাসনে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।

তেইশ

সেদিন আমার কাগজপত্রেব আবর্জনার ভিতর একখানা মোহর খুঁজে পাওয়া গেছে। সন্ধ্যেবেলায় কফির পেয়ালার সঙ্গে গৃহিণী এই সংবাদ পরিবেশন করলেন। মোহরখানা দেখিয়ে বললেন: নাৎনির মাথাব একটা ফুল গড়িয়ে দেওয়া যাবে!

মোহরখানা হাতে নিয়ে চমকে উঠলুম। এই সেই ফুটো মোহব! প্রথম যৌবনে একদিন একে বুকে করে দেশে এনেছিলুম। দুস্তব পার্বত্যপথে অনাহারে অর্ধাহারে কাটিয়েছি কতদিন, কত রাত্রি ঘুমতে পাবি নি ক্ষুধাব জ্বালায। কিন্তু এই মোহবখানা সেদিন ভাঙাতে পারি নি। মনেব বঙে বাঙা হয়ে আছে ওই সোনাটুকু। বললুম: ও সোনা থাক্, নাৎনিব ফুল গড়িয়ে দিও দস্তাব টাকায।

—সমাপ্ত—